গণনায়ক

সতীনাথ ভাদুড়ী

বেঙ্গল পাব্লিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৫৫
দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৬২
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
মুদ্রাকর—চাঁদমোহন ঘোষ
চাঁদমোহন প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৪, নন্দলাল মল্লিক লেন,
কলিকাতা—৬
প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স
আড়াই টাকা।

শ্রদ্ধেয়

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

—দাদামশাইকে

লেখাগুলি বিবরণমূলক। বিবরণের যাথাতথ্য সামান্য পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করিতে বাধ্য হইয়াছি,—পাছে প্রাণহীন প্রতিলিপি হইয়া দাঁড়ায়, সেই ভয়ে এবং আরও কয়েকটি কারণে।

—লেখক

গণনায়ক

পূর্ণিয়া জেলার গোপালপুর থানা, আর দিনাজপুর জেলার শ্রীপুর থানার মধ্যের সীমারেখা 'নাগর' নদী। পার্ব্বত্য 'নাগর' এখানে খুব খামখেয়ালী নয়। তাই তা'র সোহাগের অজস্রতার উপর রূঢ় ঔদাসীন্য দেখিয়ে আজও দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছে, কাঠের নড়বড়ে পুলটি। আগেকার যুগে উত্তর বাংলা থেকে উত্তর বিহারে ফৌজ পাঠাবার যে পথ ছিল, তারই উপর ছিল এই সেতু। সেই রাস্তা এখনও পুলের দু'দিকেই আছে কিন্তু তার সে জলুস আর নেই। কেবল গত বছরকয়েক থেকে গোপালপুর থানার আরুয়া-খোয়ার হাট জমে উঠেছে যুদ্ধ আর যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির দৌলতে—বিহার আর বাংলার মধ্যের বে-আইনী জিনিসের কেনা-বেচায়। পুলের পশ্চিমেই আরুয়াখোয়ার হাট। এই হাটের গা ঘেঁষে চলে গিয়েছে আর একটা রাস্তা, মালদা জেলা থেকে আরম্ভ করে পূর্ণিয়া, জলপাইগুড়ি জেলা হ'য়ে একেবারে শিলিগুড়ি পর্যন্ত। অগণিত মাল-বোঝাই গরুর গাড়ী মালদা, দিনাজপুর, আর জলপাইগুড়ি তিনদিক থেকে পুলের সম্মুখে এসে মিলিত হয়। গত বছর হাটের ইজারাদারের কাছ থেকে, বকরিদের আগে শান্তিরক্ষার মুচলেকা

নেওয়ার জন্য এসে, এস, ডি, ও, সাহেবের মোটরকার যায় পথে আটকে। তা'র পর থেকে পথের গর্তগুলো বুজেছে।

বাইরের জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ ষোল মাইল দূরের সুধানী ষ্টেশন থেকে। চোরাকারবারের কেন্দ্র আরুয়াখোয়া বাজার থেকে পুল পার হযে যায় গরু, মোষ, চিনি, ঘি; আর বাংলা দেশ থেকে আসে চাল আর ধান।

হিন্দু মুসলমানের মিশ্রিত জনসংখ্যা। হিন্দুদের মধ্যে অধিকাংশই রাজবংশী। গত বছরের কলকাতা, নোয়াখালি আর বিহারের নানা প্রকাব বিকৃত খবর, তাদের মনে গভীব রেখাপাত করেছিল ঠিকই; কিন্তু এব চিড়খাওয়া মনও কয়েক দিনের মধ্যে জোড়া লেগে গিয়েছিল। গতানুগতিকতার তাগিদে, পেটের ধান্দায় জোড়াতালি দেওয়া জীবন একরকম কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু সেই পুরানো ফাটল দিয়ে ভাঙ্গন ধরল হঠাৎ।

সুধানী-গোলার জহুরমল ডোকানিয়ার 'মুনীম' (গোমস্তা) এক শনিবারের রাতে আরুয়াখোয়া হাটে গাড়ী নিয়ে যাচ্ছেন। চিনির বস্তাগুলির উপর ত্রিপল বিছানো। বাতে খেয়ে-দেয়ে গাড়ী চড়লে আরুয়াখোয়ায় গাড়ী পৌছুবে কাল সকালে। বিড়িটায় শেষ টান মেরে ছোট অবশিষ্টটুকু গাড়োয়ানকে দেন। বিলটগাড়োয়ান খুশী হয়ে ওঠে।

"গামছা বিছিয়ে শুয়ে পড়ুন মুনীমজী। একেবারে আরুয়াখোয়ায় উঠবেন। ঘন্টায় কোশ যায় গরুর গাড়ী, দূরের সফরে। আর ধরুন রাতবিরাতের জন্য এক ঘণ্টা ফাজিল রাখলাম। সকাল এক প্রহরের সময়, আরুয়াখোয়ায় গিয়ে দাতন করবেন।"

মুনীমজী আজকে খুব খুশী আছেন। তিনি যাওয়ামাত্র সকলেই তাঁর কাছে দেশের 'হালচাল' জিজ্ঞাসা করে। পথে যার সঙ্গে দেখা হয়, এমন কি কনূসী এল, পি, স্কুলের গুরুজী পর্য্যন্ত তাঁর কাছে খবর

জিজ্ঞাসা করে। একে অতবড় গোলার লেখাপড়া জানা মুনীম; তার উপর তাঁর মালিকের বাড়ীতে 'বিজলী'তে খবর আনাবার কল আছে! সেই কলে লাটসাহেব পর্যন্ত ডোকানিয়াজীর সঙ্গে কথা বলেন, কত লোক কত খবর সেখানে দেয়, কত আওরৎ তাঁকে খুশী করবার জন্য গানবাজনা শোনায়। কাজেই মুনীমজীর কথার গুরুত্ব স্থানীয় লোকদের কাছে অনেকখানি।

"দেখিস রাতে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে কি নিয়ে যাচ্ছিস, তা'হলে বলিস, আলু; আলুব বোরাটা সম্মুখে আছে তো?"

"জী"

"আমি পিছনেই শুই চিনির বস্তাগুলোর উপর। সম্মুখের দিকে চিনির বস্তাগুলো রাখতে পারলে একটু আরামে শোয়া যেত, ঝাঁকানি কম লাগতো।"

"জী"

"মীরপুরে একটু সাবধান থাকিস। ওখানকার গ্রাম এডভাইজরী কমিটির সেক্রেটারী ভারী বজ্জাত। তার উপর আজকাল দুনিয়া শুদ্ধ সকলে সেক্রেটারী হযে উঠেছে, দেখিসনা? ওখানে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে আমাকে ডেকে দিবি। ও' গাঁখানা দিয়ে যাবার সময় চীৎকার করে গান গাইতে গাইতে যাস্; চুপচাপ গেলেই সন্দেহ করবে। অনর্থক কতকগুলো টাকা খরচ। গাঁয়ের সেক্রেটারীর দাম গড়ে টাকা দশেক। মারপুরেরটাকে কিনতে টাকা পঞ্চাশের কম লাগবে না। সাবধান।"

"সে আর আমায় বলতে হবে না হুজুর। আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি খুব হেপাজৎ করে চালাব; খানা গর্ত বাঁচিয়ে!"

মুনীমজীর ঘুম আর আসে না। যে খবর তিনি নিয়ে যাচ্ছেন, তা' শুনলে হাটশুদ্ধ লোক চমকে যাবে। এমন জবর খবর বহুকাল

এ'মুল্লুকের লোক শোনেনি।...না, চিনির বস্তায় পিঁপড়েগুলো আর ঘুমোতে দেবে না। ঐ হাঁদা-গঙ্গারাম বিলটুটা কি বস্তাগুলো তুলবার সময় ঝেড়েও তোলেনি!

"এই বিলটু ঢুলছিস না কি?"

"না, এই একটু চোখের পাতা ভারি হ'য়ে আসছিল হুজুর।" মুনীমজী জানেন যে এইবার বিলটু আমতা আমতা করে বিড়ি চাইবে ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য।...আর করেই বা কি বেচারী—সারারাত জাগতে হবে তো?...বিলটু আবার ঐ ভাসাভাসা শোনা খবরটা পথের লোকদের দিতে দিতে না যায়।

"এই বিল্টা। এই নে, বিড়ি দেশলাই রাখ্। আর আজকের সুধানীতে শোনা খবরটা কাউকে বলিসনা যেন।" বিলটু এতক্ষণ খবরটি সম্বন্ধে কিছুই ভাবেনি। মুনীমজীর কথার পর খবরটা মনে করবার চেষ্টা করে।...

"না, না, মুনীম সাহেব, সে আর আমায় বলতে হবে না। এতকাল আপনাদের নুন খাচ্ছি, কোনদিন খবর বলতে শুনেছেন? গরীব মানুষ, আমাদের খবর দিয়ে দরকার কি?

প্রসন্ন মনে সে বিড়ি আর দেশলাই নেয়। তারপর বাঁয়ের বলদের লেজ মুড়তে মুড়তে তার নিকট আত্মীয়ার উদ্দেশে গালি দিতে আরম্ভ করে।

মুসহর সাওয়ের দোকানের সম্মুখে গাড়ী পৌছায় প্রায় বেলা দশটার সময়।

"রাম রাম মুনীমজী!"

"জয়গোপাল! জয়গোপাল!"

মুসহর সাও আর তার ছেলে, গাড়ী থামবার সঙ্গে সঙ্গে চিনির

বস্তাগুলি বাড়ীর আঙ্গিনার ভিতর নিয়ে রাখে,—এখনি আবার অন্য লোকেরা এসে পড়বে।···

"চার বোরা মোটে?"

"কত ধানে কত চাল, তার তো হিসাব রাখো না। ঐ আনতেই হিমশিম খেয়ে যেতে হয়। যা দিনকাল পড়েছে, মিলের ছাপমারা বোরার উপর অন্য বোরা ঢুকিয়ে, ডবল বস্তার মধ্যে কোন রকমে আনা।"

আলুর বোরাটা দোকানের সম্মুখেই নামিয়ে রেখে, সাওজী বলে "এবার বলুন হালচাল।"

মুনীমজী গম্ভীর হয়ে যায়; প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দাঁতন আনতে বলেন। সাওজী বোঝে, আজ কিছু জবর খবর আছে। একে একে লোক জমতে আরম্ভ করে। বেশীর ভাগই দোকানদার; দুচার জন দূর গাঁয়ের লোক, যারা চালের গাড়ী নিয়ে এসেছে হাটে। অজস্র "রাম রাম মুনীমজী'র প্রত্যভিবাদন ইঙ্গিতে সেরে মুনীমজী একমনে দাঁতন করতে থাকেন; ভাবে মনে হয়, সংসারে তাঁর দিকদারি ধরে গিয়েছে! সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে,—কতক্ষণে তাঁর মুখ ধোয়া শেষ হবে, কতক্ষণে তাঁর মুখের দুটো কথা শুনতে পাবে। ···এইবার গামছা দিয়ে মুখ মুছছেন; আবার স্নানের জন্য তেল চাইবেন না তো······।

অন্য দিন হ'লে সাওজী নিজেই স্নানের কথা তুলতো; এখন ইচ্ছা করেই খবর শোনবার লোভে সে কথা ওঠায় না। মুনীমজী বিলটু গাড়োয়ানকে দুইজনের জন্য দই চিড়ে কিনবার পয়সা দেন।

"ভাল দেখে গুড়ও কিছু আনিস; চিনি তো আর পাওয়ার জো নেই এক চিমটি, এই যবে থেকে কংগ্রেস মিনিষ্ট্রি হয়েছে।"

তারপর মুনীমজী সমবেত লোকদের দিকে না তাকিয়ে, ট্যাঁকে কয়েকটি অবশিষ্ট খুচরো পয়সা গুঁজতে গুঁজতে বলেন, "আর কি,

দিনাজপুর জেলা তো পাকিস্তান হয়ে গেল।" কথার সুরে মনে হয় এ একটা সাধারণ খবর, হামেশাই এ রকম বহু জেলা পাকিস্তান হয়ে থাকে। এতক্ষণে তাঁর সম্মুখের লোকদের দিকে তাকাবার অবকাশ হয়। ভঙ্গীতে আত্মপ্রত্যয় ফুটে বেরুচ্ছে; কোন বিশ্ববিশ্রুত দেশনায়ক সাংবাদিকদের বৈঠক ডেকেছেন যেন।

মুহূর্তের জন্য সকলে নীরব হ'য়ে যায়। শ্রীপুরের রাজবংশী দর্পণ সিং এর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। আর সকলের বুক ঢিপ ঢিপ করে—না জানি তার জেলার কি হয়েছে; এইবার বুঝি মুনীমজী তাঁর গাঁয়ের কথা বলবে। সাওজীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে ভয়ে;—তার দোকান, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার! সে সাহসে বুক বেঁধে জিজ্ঞাসা করে—"আর আমাদের আরুয়াখোয়া?"

"আরুয়াখোয়া তো পূর্ণিয়া জেলা, হিন্দুস্থানে। এ তো আর বাংলামুলুক নয়,—এ হচ্ছে বিহার। এখানে আর কারও টু ফ্যাঁ চলবে না।"

হাটের দোকানদাররা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। মুনীমজী এক সঙ্গে সব খবর বলে ফেলেন না,—আস্তে আস্তে টিপে টিপে খবর ছাড়েন। এতগুলি লোক উদগ্র উৎকণ্ঠায় তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছে, লাটসাহেবের বেতার বক্তৃতার মত তাঁর কথার দাম আছে এখানে। এই সময়টুকুকে যত টেনে বড় করা যায়,—এই মানসিক বিলাসের মোহ কম নয়।

দূরের হাটুরেরা চালের গাড়ী নিয়ে সকলের চেয়ে আগে আসে। তাদের মধ্যে থেকেও অনেকে এসে জমেছে এখানে।

অছিমদ্দী জিজ্ঞাসা করে "মীরপুর কোথায় পড়লো হুজুর?"

"মীরপুর কোন জেলায়?"

কাঁদো কাঁদো হয়ে অছিমদ্দী বলে "হরিশ্চন্দ্রপুর থানা।"

সাওজী বলে দেয়—"ও হলো মালদা জেলা।"

"মালদা জেলা পড়েছে পাকিস্তানে।"

আল্লার এই অসীম করুণায় অছিমদ্দী এত অভিভূত হয়ে পড়ে যে সে আর কোন কথা বলবার ভাষা খুঁজে পায় না।

বজরগাঁর পোড়াগোঁসাই ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসেন। ...ইনি রাজবংশীদের পুরোহিত। এই এলাকায় এঁর অনেক যজমান আছে। সাওজী উঠে এঁকে খাটিয়ায় বসতে দেন। তাঁর কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। একেবারে মুনীমজীর সম্মুখে যেতে যেতে প্রশ্ন করেন—"আর বজরগাঁ? তিতলিয়া থানা, জলপাইগুড়ি জেলা?"

"বাবাজী, আপনি জলপাইগুড়ি জেলার জন্য চিন্তা করবেন না। রামজীর আশীর্ব্বাদে ওটা হিন্দুস্থানেই পড়েছে।"

"পড়বে না? বাপ-পিতাম'র আমল থেকে আমরা রয়েছি বজরগাঁয়। পাকিস্তানে চলে গেলেই হলো! জল্পেশ্বরের এলাকা, মহাকালের রাজ্য, চলে যাবে পাকিস্তানে? বড়লাট ভারি সমজদার লোক। নারায়ণ! নারায়ণ!"

নারায়ণকে প্রণাম করবার সময় অছিমদ্দীর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। কৌতূহল ও উদ্বেগের মধ্যে এতক্ষণ সকলে তার অস্তিত্বের কথা ভুলে গিয়েছিল। এখন সকলেই তার দিকে তাকানোয়, সে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ...এক কাসেম ছাড়া আর সকলেই তাকে অপরাধী মনে করছে। তার গাঁয়ের আসগর আলী পত্তনিদারই নিশ্চয় চেষ্টা করে তার গাঁ'কে পাকিস্তানে নিয়ে গিয়েছে।......

খবরটায় তার আনন্দ হয়েছে এইটুকু তার অপরাধ। তবুও সে বোঝে যে সে এখানে অবাঞ্ছিত। সে কাসেমকে হাত ধরে বাইরে নিয়ে যায়। দূরে তাদের গাড়ীর কাছে গিয়ে অছিমদ্দী একগাল

হেসে বলে, "বাপকা বেটা আসগর আলী পত্তনিদার; কথা রেখেছে। চল্, তাড়াতাড়ি ধান বেচে—যা দাম পাওয়া যায়। গাঁয়ে গিয়ে পত্তনিদারের সঙ্গে দেখা করে শোক্‌রিয়া জানাতে হবে।"

কাসেম বলে, "এখনই ফিরে চল; ভয় করে হাটে আজ এদের মধ্যে।"

"ধান না বেচলে ওষুধ কিনবি কি দিয়ে? একবার খরচ করে দু'জেলার চাল ধরার পুলিশদের মণ পিছু দুটাকা করে দিয়েছিস। ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হলে আবার ঐ খরচ করতে হবে। এদিকে রোজগারের নামে খোঁজ নেই। এখানে হাজী সাহেব হাটের ইজারাদার। ভয়টা কিসের শুনি? গোলমাল হলে লেঠেল দিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবে না!"

কাসেম সাহসে ভর করে ইজারাদারের কাছারিতে যায়—হাজার হোক মুসলমানতো ইজারাদার সাহেব! আগে হ'লে কাসেমের এ সাহস হ'তোনা, কিন্তু গত বছর বিহারের কাণ্ডের পর মুসলমান আর মুসলমানের কাছে যেতে ভয় পায় না। কাসেম দেখে যে সেখানে আরও অনেকে বসে রয়েছে। সকলেই ইজারাদারকে শাসাচ্ছে। ইজারাদার সাহেব সকলকে শান্ত করেন। দূরের লোকদের তখনই বাড়ী ফিরতে বলেন। "চারিদিকে হিন্দু বস্তি। সকলে খুব সাবধানে থাকবে। রাতে পালা করে জাগবে। কিষাণগঞ্জ সাবডিভিসন হিন্দুস্থানে গেলেই হ'লো! এর আমি বিহিত করছি। খবর এখনও সঠিক পাওয়া যায়নি। ঐ মুনীমটার কথায় বিশ্বাস কি?"

কাসেম আর অছিমদ্দীর মনে শেষের কথাটা ছাঁৎ করে লাগে। দুজনেই একসঙ্গে কথাটার প্রতিবাদ করে ওঠে। উপস্থিত সকলে কটমট করে তাদের দিকে তাকায়। তা'রা তাড়াতাড়ি ইজারাদার সাহেবকে তাদের ধানটা কিনে নিতে বলে—যে কোন দামে হোক।

নিজের 'মঝবে'র লোকের জন্য ইজারাদার সাহেব নিজের দরকার না থাকলেও তাদের ধানটা কিনে নিতে কর্ম্মচারীকে আদেশ দেন। "দরটা ঠিক করে নিও, মাসুম, বুঝলে।" মাসুম পুরানো কর্ম্মচারী—সে মনিবের ইঙ্গিত ঠিক বোঝে।

ইজারাদার সাহেব সকলকে বোঝান। "আরে মিয়া, লাটসাহেবের কথাও বদলায়—ঠেলায় ফেলতে পারলে। আমি আজ রাতেই যাচ্ছি সদরে। পাঁচশ টাকা চাঁদা নিয়ে গেল জেলা পাকিস্তান কনফারেন্সে—সদর সাহেব কত রকমের কথা বললেন, আর চলে গেলেই হলো এ জেলা হিন্দুস্থানে। কেবল কতগুলো টাকা অনর্থক খরচ হবে এই যা।"

হাট আর আজ জমলো না। লোকের মুখে মুখে মুনীমজীর খবর হাটের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সাওজীর দোকান লোকে লোকারণ্য হ'য়ে যায়। সকলেই মুনীমজীর নিজের মুখ থেকে খবর শুনতে চায়। নানা প্রশ্নে সকলে তাকে উদ্ব্যস্ত করে তোলে। দিনাজপুর আর মালদার হিন্দু হাটুরেরা দলবেঁধে আসে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে। মুনীমজী বাইরের অন্য লোকদের সরিয়ে দিতে বলেন সাওজীকে—কি জানি কোন মুসলমান যদি থেকে যায় ভিড়ের মধ্যে। মালদা, দিনাজপুরের হিন্দুদের সঙ্গে তিনি অনেকক্ষণ একান্তে কথাবার্ত্তা বলেন। এই বিপত্তির সময় মুনীমজীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত সহানুভূতিতে তারা মনে বল পায়। ওদেশে থাকা আর নিরাপদ নয়; আত্মীয় পরিজনদের বাড়ী থেকে সরাতে হবে। তারা আর অপেক্ষা না করে হাট ভালভাবে বসবার আগেই ফিরে যেতে চায়। আর্দ্রস্বরে মুনীমজী তাদের বলেন যে, তাদের এক মুহূর্ত্ত দেরী করা উচিত নয়। তাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি তাদের সব চাল কিনে নেন—ষোল টাকা দরে। গত হাটে চালের দাম ছিল উনিশ, কাল সুধানীর বাজারে ছিল বাইশ।

খানিক পরে ইজারাদার সাহেবের সেপাই খবর দেয় যে, তিনি মুনীমজীকে ডেকেছেন। তিনি যেতেই তাঁকে এক আলাদা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসান ইজারাদার সাহেব। বেতারের খবর সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হওয়ার পর ইজারাদার সাহেব বলেন "আমার এ হাট এবার গেল। যাক, সে তো বরাতে যা আছে হবেই। এসব তো এখনো অনেক কাল চলবে, এখন কাজের কথা হোক। আজ ক' বোরা চিনি এনেছো ?"

"এনেছি চার বোরা। এক বোরা সাওজীকে দিতে হবে। তোমার তিন বোরা। এবার কিন্তু সত্তর টাকা মণ।"

"তাজ্জব কথা! এতদিন ছিল ষাট টাকা, আজ হঠাৎ দাম বাড়ালে চলবে কেন? আর সাওজীকে আধ বস্তা দাও—আমাকে সাড়ে তিন বস্তা। গতবারে যে চিনি দিয়েছিলে, তা ছিল একেবারে ভিজে।"

"সাওজীর তো মোটে এক বস্তা—তার মধ্যেও তোমার পাকিস্তানের দাবি! সে হয় না; ওকে এক বস্তা পুরো দিতেই হবে; কথার খেলাপ যেতে পারে না। আর চিনি ভিজবে কি করে? ত্রিপল দিয়ে ঢেকে আনা। হ্যাঁ, আর দুটো করে পাটের বস্তা যে বিনা পয়সায় পাচ্ছ, তার দাম কি আমি ঘর থেকে দেবো নাকি? বললেই হলো, ভিজে! তার উপর মালদা আর দিনাজপুর এখন তো পাকিস্তান হ'লো। সেখানে এখন তো খুব ক'দিন মোফিল চলবে। ঈদের জন্য চিনিও লোকে এখন থেকেই যোগাড় করবে; আড়াই টাকা সের অনায়াসে তুমি পাবে।"...মুনীম সাহেবের কথার বন্যায় ইজারাদার সাহেবের যুক্তিস্রোত ঘুলিয়ে যায়; থই না পেয়ে মৃদু প্রতিবাদ জানায়। "কি যে বলো মুনীমজী; মুসলমানের হাতে পয়সা কোথায়?"

"আচ্ছা যাও, দু টাকা কম দিও। হ্যাঁ, তবে আর একটা কাজ করতে হবে ইজারাদার সাহেব, আমাকে খান কয়েক গরুর গাড়ী

ঠিক করে দিতে হবে। সুধানীর গোলায় চাল নিয়ে যাবে। এখানে অত রাখবার জায়গা নেই। বর্ষার দিন, বাইরে পড়ে রয়েছে। তোমার হাতে আছে অনেক গাড়োয়ান।"

"আচ্ছা সে হয়ে যাবে সব ঠিক। ভোর রাত্রে গেলেই হবে তো?"

মাসুম এসে খবর দেয় যে, হাটের লোকরা ক্ষেপে গিয়েছে। তারা দল বেঁধে কাছারিবাড়ীর মাঠে ঢুকছে। তারা মুনীমজীকে ফেরত চায়—আপনি নাকি তাঁকে আর জিন্দা ফিরতে দেবেন না।

বাইরে তুমুল কোলাহল শোনা যায়।

"লোকগুলো পাগল হলো নাকি!"—ভয়ে ইজারাদার সাহেবের মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়।

দু'জনে এক সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। বাজারের স্থায়ী দোকানদাররা ইজারাদার সাহেবকে দেখে, হাটুরেদের সম্মুখে আগিয়ে দেয়, হাজার হোক তাদের জমিদার তো। মুনীম সাহেব এসে ক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করেন। স্বর নামিয়ে সম্মুখের লোকদের বলেন, "ওর সাধ্যি কি আমাকে কিছু করার। তোমরা এখনও বাড়ী ফেরনি? আজকালকার দিনে বাড়ী ঘর ছেড়ে যত কম থাকা যায় ততই ভাল। তোমরা তো সব বোঝই। আমি আর কি সলা দেবো! নিজের নিজের গাঁয়ের মোড়লদের সঙ্গে পরামর্শ করে, যা ভাল হয় ক'রো।··· মেয়ে-ছেলেদের নিয়েই বিপদ। একটু হুঁসিয়ার থাকবে। আমরা তো সুধানী বাজারেও জানানাদের রাখতে সাহস পাইনি—সব রাজপুতানায় রেখে এসেছি এই মাসে। যন্ত্রপাতির কর্ম, বলাতো যায় না, কি বলতে কি বলে। শালা লাটসাহেবের মুখ ফসকে পুর্ণিয়াটা বেরুলেই তো সব চৌপট হয়েছিল—সাবধানের মার নেই।"···

রাজবংশীদের সরু সরু চোখগুলি ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। 'পোলিয়া' মেয়েরা কান্নাকাটি আরম্ভ করে।

"আর এখন নুন কিনতে হবে না" ; "ওরে বাচ্চিদাই, কোন দিকে গেলি শীগ্‌গীরি আয় না", "ওঠ নবাব পুত্তুর, এখনও জাবর কাটছে !" "আজ দাম চাই না, থালি তুমি ওজন করে নিয়ে রাখো"…"এই টাকাটা মুনীমজী আমানত রাখবেন গোলায়, কাছে রাখতে ভরসা পাচ্ছি না"…

আতঙ্কমুখর পরিবেশ সুস্থ মনকেও দুর্বল করে তোলে। অল্পক্ষণের অস্বাভাবিক কর্মতৎপরতার পরই হাট নীরব হয়ে আসে।

পরের দিন থেকেই আরুয়াখোয়ার রূপ যায় বদলে। আগে সপ্তাহে একদিন হাট বসতো—এখন অহোরাত্র ভয়ার্ত নরনারীর নিরানন্দ মেলা। গাড়ীর পর গাড়ী আসছে পুল পার হয়ে শ্রীপুরের দিক থেকে। হেঁটে চলে আসছে দলে দলে মেয়ে, ছেলে, গরু, ছাগল। ছোট ছেলেটির মাথায় পর্য্যন্ত হাঁড়িকুড়ির বোঝা চাপানো। ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছে হাড়জিলজিলে কালাজ্বরের রুগী, একটা বিড়াল কোলে নিয়ে। কাশতে কাশতে চলেছে হেঁপো বুড়ী—পাকিস্তান থেকে বাঁচতে গিয়ে প্রাণটা বেরোয় বুঝি ! এতদিন ছোট্টো ছিল এদের জগৎ। আজ হাটে বিশ্রাম করে কতক যাবে এগিয়ে, শিকারের খেদানো হরিণের মত, অনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে। কতক যাবে থেকে ; যদি ক্ষেতের কাজ পায়, এই আশায়। পথে খাওয়ার অভাব কি,—এখন তাল পাকার সময়।

পুর্ণিয়া আর দিনাজপুর, দুটো ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মধ্যে কোনটাই 'নাগরে'র উপরের পুলের জন্য খরচের দায়িত্ব স্বীকার করে না। নড়বড়ে পুলটার উপর খুব ধকল চলেছে আজ ক'দিন থেকে। পুলের দু'দিকে ক্যাম্প পড়েছে। মুনীমজী কলকাতার এক রিলিফ সোসাইটীকে বলে ক'য়ে শরণার্থীদের সুখ-সুবিধা দেওয়ার জন্য আরুয়াখোয়ায় একটি ক্যাম্প খুলিয়েছেন। লোকাল বোর্ডে খবর দিয়ে ডাক্তার আনিয়েছেন। সব কাজ হ'চ্ছে মুনীমজীর সহযোগিতায়।

কতলোক মুনীমসাহেবের ক্যাম্পে সুখ দুঃখের কথা বলতে আসে। তিনি কাউকে আশ্বাস দেন, কাউকে রামজীর শরণ নিতে অনুরোধ করেন, কাউকে ধৈর্য ধরতে বলেন; কারও কাছে বা কংগ্রেস সরকারের দুর্বলনীতির নিন্দা করেন। তারপর রিলিফ কমিটির চিঁড়ে-দইয়ের স্লিপ কাটতে কাটতে বলেন "ক'জন? পাঁচ; এক বাচ্চা? আচ্ছা ঐ ঝাণ্ডাওয়ালা তাঁবুতে মোহর করিয়ে সাওজীর দোকানে নিয়ে যাও। সব ঠিক হয়ে যাবে।" কৃতজ্ঞতায় শরণার্থীর মন ভরে ওঠে—এই বিপদের সময় মিষ্টি কথাই বা ক'জন লোক বলে!

পুলের ওপারে রেলিঙের উপর লাগানো হ'য়েছে সবুজের উপর চাঁদতারা দেওয়া লীগের ঝাণ্ডা; পুলের এদিকে দেওয়া হয়েছে কংগ্রেসী তিনরঙা পতাকা। ওদিকে একদল চীৎকার করে, "লে লিয়া হ্যায় পাকিস্তান", "বাঁটগেয়া হ্যায় হিন্দুস্তান"; এদিকের দল চ্যাঁচায় "বন্দে মাতরম্", "জয়হিন্দ্"।

তিক্ত উত্তেজনাময় আবহাওয়া সৃষ্টি হতে দেরী লাগে না। এই বুঝি কোন কাণ্ড হয়, হয়! এদিকে গুজব ওঠে যে ওরা পুলে আগুন লাগিয়ে দেবে—যাতে জিনিসপত্র নিয়ে ওদিক থেকে আর কেউ না আসতে পারে। অমনি এদিককার লোক গর্জে ওঠে, "এদিকের গরু মোষ আর যেতে দেবো? আমরাই আগে পুলে আগুন ধরাবো।" এপারের লোকদের মুনীমজী ঠাণ্ডা করে; ওপারের লোকদের করে ইজারাদার সাহেব—পুল গেলে হাট থাকবে কোথায়—

মুনীমজী তাদের বোঝায়, "দু'দিন সবুর করতো। দেখোনা কি হয়। মহাত্মাজী কি আর চুপ করে বসে আছেন? লাটসাহেবকে দিয়ে "কমিশন" বসিয়েছেন। হেঁজিপেঁজি লাট নয়, খানদানী লোক, রাজার বাড়ীর ছেলে।"

সঙ্গে সঙ্গে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে। যেখানে যাও সকলের মুখেই ঐ একই কথা, "কমিশন", "কমিশন"।

শ্রীপুরের চুন্নালাল রাজবংশীর বুদ্ধিমান বলে খ্যাতি আছে। মুনীমজী সব খবর বলেনা না কি; তাই তাকে সকলে চালের গাড়ীর উপর বসিয়ে সুধানী ইষ্টিশনে পাঠায় 'কমিশনে'র খবর আনতে। চুন্নালাল ভয় পাবার ছেলে নয়; সে সোজা পয়েন্টসম্যান সাহেবকে "কমিশনে"র খবর জিজ্ঞাসা করে। পয়েন্টসম্যান বলেছিল যে কমিশনের খবর তো বেরিয়েছে। তাদের মাইনে আর ভাতা বাড়বে! শ্রীপুরের লোকেরা এর মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারেনি।

কমিশন! ইজারাদার সাহেবের পুরানো সেপাই ইসরাইল লাঠি ঠুকে বলে "কমিশন নেওয়া হয় গোলাতে, পাট খরিদের উপর 'ধর্ম্মাদায়' ব'লে। কোন মুসলমান আজ থেকে আর এ দিচ্ছে না। বের করাচ্ছি কমিশন। আরুয়াখোয়া হাটিয়া হিন্দুস্তানে এলেই হলো!"

দর্পণ সিং-এর বুড়ো বাবা শুকনো উরুতে তাল ঠুকে বলে "এই হাটের তোলা মুসলমান ইজারাদারকে কোন লোক দিও না। ঘর দোর জমি জিরেৎ ছেড়ে হিন্দুস্তানে এসেছি কি এমনি। সেখানে হিন্দুকে মেয়ে-বেটী নিয়ে থাকতে দেবে না শুনেছি। এখানেও আবার মুসলমানকে তোলা দিতে হবে?"…সে আরও কত কি বলতে যাচ্ছিল, দর্পণের মা তার হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে যায়— …বদলোকদের চটিয়ে লাভ কি?

হাটের তোলা দেওয়া সেইদিন থেকে বন্ধ হয়ে যায়।

মুনীমজী সাওজীকে বলে, "দেখছো, ইজারাদার সাহেব আর রাতে এ পারে থাকে না। ওদিককার ক্যাম্পের খরচ কি ওই চালাচ্ছে নাকি?"

"না, চাঁদা তুলে চালাচ্ছে ইজারাদার সাহেব। গোপালপুর থানাকে

পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার জন্য, কলকাতায় কমিশনকে টাকা খাওয়াতে হবে বলে, ও আরও অনেক টাকা চাঁদা তুলছে।"

মুনীমজীর চোখ দু'টি জ্বল জ্বল করে ওঠে; ইজারাদার সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধায় না ঈর্ষায়, ঠিক বোঝা যায় না।

সাওজী আবার বলে "তা মুনীমজী, আমরাও হাট থেকে কিছু চাঁদা আদায় করে দিতে পারি, গোপালপুর থানাকে পাকিস্তান থেকে বাঁচানোর জন্য। ইজারাদার ভারি ফন্দিবাজ লোক—কমিশনকে আবার টাকা দিয়ে হাত না করে নেয়। আপনি একটু চেষ্টা করলেই আমাদের প্রাণটা বাঁচে, পূর্ণিয়া জেলাটাও বাঁচে।"

মুনীমজী এই হিসাবই এতক্ষণ মনে মনে খতিয়ে দেখছিলেন। তাঁর হিসাবে ভুল হয় না। এখন চাঁদা তুলে যা লাভের সম্ভাবনা, তার অনুপাতে বিপদের আশঙ্কা অনেক বেশী। এক করলে হয় একটি জিনিস—চাঁদা তুলে চুপচাপ থাকা, যদি পাকিস্তানে যায় জায়গাটা তা'হলে টাকা ফেরৎ দেওয়া যাবে, বলা যাবে যে হাকিমদের ঘুষ খাওয়ানো গেল না; আর যদি পাকিস্তানে না যায়, তা হ'লে টাকাটা নিয়ে বললেই হবে যে কমিশনকে খাইয়েছিলাম।......না, দরকার কি ঝঞ্ঝাটে। যা রয় সয় তাই ভাল।...

"না না সাওজী, ওসব হাঙ্গামায় আমি পড়তে চাই না। ওর জন্য কংগ্রেস সরকার রয়েছে, মহাত্মাজী রয়েছেন, আমার মালিক রয়েছেন। কিন্তু পুলের দুদিকেই যে মাল আটকাচ্ছে, তার কি উপায় করা যায় বল। বর্ষার নদী। অন্য সময় হলেও না হয় একটা কিছু ব্যবস্থা করা যেত।"

"দুদিককার ধান চালের পুলিশও দেখছি, আজ কদিন থেকে যুধিষ্ঠিরের বাচ্চা হয়ে উঠেছে। আজ দেড়শো টাকার লোভ ছেড়েচে—দেড়শো মোষ যাচ্ছিল মজঃফরপুর থেকে মৈমনসিং। ওপারের

চালের অফিসারও ক'দিন থেকে টাকা নিচ্ছে না, এ হাটতো উঠে যাবে দেখছি। সাধে কি আর ইজারাদার হাটে থাকার অভ্যাস কাটাচ্ছে!"

"হাকিম টাকিম আসতে পারে, এই ভয়ে নিচ্ছে না বোধ হয়। দুচার দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। ঘাবড়ো না। এত ভাবনা কিসের? রিলিফের কাজ তো তোমার দোকান থেকে চলছেই। এত এখন ভাববার দরকার কি তোমার? কারবারী লোক আমরা, কোন রকমে দুপয়সা রোজকার করবই।"

সাওজী এ কথায় সায় দেয় বটে, কিন্তু মুখ দেখে বোঝা যায় যে সে বিশেষ ভরসা পাচ্ছে না......রিলিফের জিনিসের লাভের থেকে টাকায় চার আনা দিতে হবে, মুনীমজীকে···কত আর থাকবে।......

"এক মানুষ হয়েছিলো পাটের গাছগুলো," "গোঁয়ার গোবিন্দ জামাই এলো না, মেয়েটার কপালে অনেক খোয়ার আছে", "ওলাউঠায় গাঁ যখন উজার হ'য়ে গিয়েছিল তখনও গাঁ ছাড়িনি··· নিত্য নূতন স্বরে, নূতন ভাষায় শোনা যায়,···একই দুঃখগীতির পুনরাবৃত্তি।

দর্পণ সিং বাবাকে সান্ত্বনা দেয়, যাক, মেয়েদের ইজ্জৎ বেঁচেছে। বৃদ্ধ কেঁদে ফেলে, "আমার চাকর এরফান আমার ষাট বিঘা জমি পেয়ে যাবে। এই হ'লো ভগবানের বিচার!"

ইজারাদার সাহেব দিনের বেলায় কাছারি ঘর থেকে দেখে তিনরঙা ঝাণ্ডাটি......হাওয়ায় উড়ছে আর ঐ সঙ্গে ছড়িয়ে দিচ্ছে নৈরাশ্য, বিদ্বেষ, আর আতঙ্কের বিষ—যার প্রতীক ঐ তিনটি রং......ইচ্ছা হয় এই মুহূর্তে ওপারের সবুজ পতাকার কাছের ক্যাম্পে চলে যাই। এতটুকুর মাত্র ব্যবধান; কিন্তু এরই মধ্যে কত পার্থক্য। একটি তার নিজের। এর নীচে আছে শান্তি, সুখ, অনাবিল আনন্দ, 'অল হিলালে'র

ছায়ার তলের নিরাপত্তা।—কিন্তু এই রাজবংশীগুলোর ভয়ে, নিজের জমিদারি ছেড়ে পালালে আর কখনও ভবিষ্যতে এ হাট থেকে, এক পয়সাও তোলা উসুল করা যাবে? কমিশনের রায় কি হবে বলা যায় না—সবই খোদার মর্জি।—

দর্পণ সিং-এর স্ত্রীকে সাওজীর মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে—"তোমরা তো পুলের ওপারে পাকিস্তান হওয়ার পর একদিন ছিলে। হাওয়াতে কি রসুন ফোড়নের দুর্গন্ধ নাকি? লোকগুলো শাক ডাঁটা সে রাতে কাউকে খেতে দিয়েছিল? বজ্জাতি আরম্ভ করেছিল বুঝি?"

প্রশ্নের বাণে জর্জরিত হয়ে সে কোন প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না। আপন মনে বকে চলে—"লক্লকে কুমড়ো গাছটা থেকে প্রাণে ধরে একদিন একটা ডগা, ডাঁটা খাওয়ার জন্য কাটতে পারিনি! সেটাকে দিয়ে এলাম গোড়া থেকে কেটে বঁটি দিয়ে। বলদ জোড়াও ভয় পেয়েছিল না কি, কুমড়োর ডগা এগিয়ে দিতে শুঁকে মুখ ফিরিয়ে নিল।—চ্যালাকাঠ দিয়ে আসবার সময়, উনুনটা ভেঙ্গে দিয়ে এলাম,—কি সুন্দর করে ঝকঝকে তকতকে উনুনটা তুলেছিলাম,—তাতে রাঁধবে কিনা এরফানের চাচী,—আর যে জিনিস রাঁধবার নয় সেই সব জিনিস!···বিপদ হ'য়েছে ঠাকুরের মুর্তিটিকে নিয়ে। ঐ জন্যই ছিল ভয়। ঠাকুরের অসীম কৃপা। —আমরা বোকা মুর্খ মানুষ, তাই তাঁর ভাবনা ভেবে মরি। দেখি, আবার পুরুত মশাই ও সম্বন্ধে কি বিধান দেন। এখানে ছত্রিশ জাতের মধ্যে ভাল করে যে দুটো ভোগ দেবো সে উপায়ও রাখলে না ঠাকুর,—"

দর্পণের স্ত্রী ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করবার জন্য হাত তুলতে গিয়ে বোঝে যে দু'জনেরই অজ্ঞাতে কখন সাওজীর স্ত্রী তার বেনে-সুলভ হিসাবনিকাশের মন ভুলে গিয়ে তার হাত চেপে ধরেছে।

দরদী হাতের স্পর্শ ছাড়িয়ে ঠাকুরকে যুক্ত করে প্রণাম করতেও মন চায় না।···মাত্র তিন দিনের পরিচয়—কোন দূর দেশ সেই বালিয়া—সেখানকার বেনে বৌ;—তার বুকে মুখ গুঁজে কেঁদে দর্পণের স্ত্রী নিজের মনের গুরুভার লাঘব করার চেষ্টা করে।···

দুরদৃষ্টের আকস্মিকতা লোকদের এ কয়দিন অভিভূত করে ফেলেছিল। দিন কয়েকের মধ্যে বিপদ গা সওয়া হ'য়ে যায়, আতঙ্কের তীক্ষ্ণ অনুভূতি আসে ভোঁতা হয়ে। গরুর গাড়ীর ভাড়া আর খাবারের দাম যা দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল, আবার কমে আসে। চালের পুলিশদের ন্যায়নিষ্ঠ হওয়ার তিন দিনের বাতিক সেরে যায়। গাড়ী গাড়ী চাল পুল পার হ'য়ে আসতে আরম্ভ করে, হাজারে হাজারে গরু মোষ ওপারে যায়।

সব কাজের মধ্যেও লোক কমিশনের খবরের জন্য ব্যস্ত। মুনীমজী প্রথম হিড়িকেই যত চাল কিনেছেন, সব পাঠাচ্ছেন সুধানীতে; প্রত্যহ অজস্র গাড়ীতে বোঝাই করে। মুনীমজীর কথা স্বতন্ত্র, তাই তাঁর ভাড়া কম লাগে। লোক তাঁর কাছে এত কৃতজ্ঞ যে তিনি যদি বিনা পয়সায়ও গাড়ী নিয়ে যেতে বলেন,—তাহ'লেও গাড়োয়ানরা নিজেদের কৃতার্থ মনে করতো হয়তো।···

"কিন্তু মুনীমজী সাচ্চা আদমী;—হিঁদুর ছেলে, আর এদিককার মছলী খাওয়া হিঁদু নয়। রাজপুতানা, বীরের দেশ,—রাজা আর শেঠের দেশ,—তারা মুসলমানদের কাছে একদিনের জন্যও মাথা নীচু করে নি। তিনি মাগনা তোমাদের গাড়ী নেবেন না; বেগার গাড়ী নিতে পারে মুসলমান ইজারাদার। মুনীমজী ওয়াজিব ভাড়া দেবেন তোমাদের।"

"সে কথা আর বলতে হবে না সাওজী। কমিশনের খবর কবে বেরোবে?"

"কে জানে। শুনছিতো দু এক দিনের মধ্যে। মুনীমজী বলছিল যে মুসলমানরা আবার এতেও বখেরা লাগিয়েছে।"

"সাওজী, মুনীম সাহেবের চিঠি আজ আমার হাতে দিও।"

"তুই তো পরশু নিয়েছিলি শুকদেব। আজ আমাকে দিও।"

"আমাকে" "আমাকে"—কমিশনের খবরের জন্য মুনীম সাহেব প্রত্যহ সুধানী গোলাতে যে চিঠি দেন, সব চালের গাড়ীর গাড়োয়ানই, তা নিয়ে যাবার সৌভাগ্য পেতে চায়।

সিরিলাল সাওজীকে জিজ্ঞাসা করে "সুধানী গোলায় যে লাট সাহেবের খবর দেওয়ার কল আছে, তাতে যত খবর আসে সব কি দোকানের লম্বা খাতায় লেখা হয় না কি? সেদিন মুনীমজীর চিঠি গোলায় দেওয়ার পর সেটা তারা খাতায় লিখে নিল; আর খাতা থেকে দেখে দেখেই জবাবের চিঠি দিল।"

"হবে! ওসব বড় বড় গোলার কাণ্ড কারখানা। আমরা আদার ব্যাপারী—ওসব খোঁজও রাখি না। রামজীর কৃপায় আর তোমাদের সেবা করে বালবাচ্চাকে দুটো খেতে দিই। মিশ্রিলাল আজ চিঠি নিয়ে যাবে। আর সিরিলাল, কাল মুনীমজী নিজেই যাবে সুধানীতে। তোর গাড়ীতে একটা টপর দিয়ে নিতে পারবি না? আচ্ছা, আমি যোগাড় করে দেবো। ইজারাদার সাহেবতো তার টপর দেওয়া গাড়ী মুনীম সাহেবকে দিতে পারলে বর্তে যায়। কিন্তু মুনীমজী সে বান্দাই নয়। ও মরদ কা বেটা। ইজারাদারের কাছ থেকে এক কানাকড়ির উপকার নিতেও রাজী নয়। কাল চাই একজন বিশ্বাসী গাড়োয়ান। লোকের আমানতী টাকা চাল কেনার পরেও কিছু বেঁচেছে মুনীমজীর কাছে। সেই সব পাবলিকের টাকা গোলায় রাখতে হবে। চোর-ছ্যাঁচড় ভরা হাটের মধ্যে কি অত টাকা রাখা যায়? গোলা থেকে পরে, গোলমাল

মিটলে এই পুরো টাকা ফেরৎ দেবে সকলকে;—এক পয়সাও কেটে নেবে না। তেমন চোর গোলাই নয়; ডোকানিয়াজীর গোলা—লাটসাহেব পর্যন্ত জানে।"

"মুনীমজী!" "মুনীমজী!" যেখানে যাও কেবল মুনীমজীর গল্প। তাঁর স্নানাহারের পর্যন্ত সময় নেই। দিন-রাত কাজ করছেন, কি করলে শরণার্থীদের একটু সুখ-সুবিধা হয় কেবল তারই চেষ্টা!

দর্পণ সিং-এর বাবাকে তিনি আগাম টাকা দেবেন বলেছেন। বুড়ো চেয়েছিল এরফানকে ঠাণ্ডা করতে—সে কিনা রাজবংশীর মেয়েকে বিয়ে করবে বলে। সব বিপদ তুচ্ছ করেও মুনীম সাহেব এরফানকে সায়েস্তা করবার জন্য, দর্পণের ষাট বিঘা জমি কিনে নেবেন কথা দিয়েছেন। আর গোলার জোতের অধীনে পনর বিঘা বন্দোবস্ত দেবেন বলেছেন দর্পণকে—অবিশ্যি কমিশনের রায়ের পর।

মুনীম সাহেবের কর্ম্মক্ষমতায় বিহার বাংলা দুই দিককার সরকারী কর্ম্মচারীরাই সন্তুষ্ট, কলকাতার রিলিফ সোসাইটি তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ; হিন্দুরা সকলেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ, মুসলমানরা তাঁর উপর একেবারে বীতশ্রদ্ধ নয়।

"পনেরই আগষ্ট, হিন্দুস্থান আজাদ হবে"—মুনীমজী সব দোকানদারকে খবর দেন।

"আর পাকিস্তান?"

"হ্যাঁ, পাকিস্তানকেও আজাদী দিতে হবে ঐ দিন।"

সমবেত শত শত লোক প্রশ্ন করতে চায়—'ওটা কি আর কিছুতেই আটকানো যায় না?' যেন এই নীরব প্রশ্নেরই উত্তর দিতে বাধ্য হয়ে মুনীমজী জবাব দেন "এই নিয়েই যদি খুশী হ'স তো নে।" মুসলমানদের প্রতি একটা দমকা উদারতার ঝাপটায়—'দিন কয়েক পরেই ঠেলা বুঝবি'—কথা কয়টা জিভে আটকে যায়।

দিনাজপুর আর মালদার শরণার্থীদের ভীতিবিহ্বল মুখে উৎকণ্ঠার ছায়া ঘনিয়ে আসে। এক সঙ্গে সকলেই প্রশ্ন করে—"কমিশন" "আর কমিশনের রায় ?"

"ও বেরোবে দিন কয়েক পর। তবে পূর্ণিয়া জেলা, মানে এই আরুয়াখোয়া পাকিস্তানে যাবে না একথা ঠিক হয়ে গিয়েছে।" পূর্ণিয়া জেলার লোকরা, বিশেষ করে আরুয়াখোয়া বাজারের দোকানদাররা চীৎকার করে ওঠে "গান্ধীজি কী জয়!" ছাতা, খড়ম, গামছা উপরে উৎক্ষিপ্ত হয়। যদু পানওয়ালা আনন্দে নাচতে নাচতে, তার সমস্ত পানের খিলি হরিরলুঠ দিয়ে দেয়।

মালদা, দিনাজপুরের অনেক লোক পূর্ণিয়া জেলায় মুনীমজীর কাছ থেকে জমি নেওয়ার কথাটা আবার তোলে।

পূর্ণিয়া জেলার এদিকটা ম্যালেরিয়া কালাজ্বরের এলাকা। পড়তি জমি পড়ে আছে কোশের পর কোশ—অভাব পয়সার, অভাব চাষ করবার লোকের।

······এত সিকমীদার পাওয়া যাবে।—তার উপর প্রচুর সেলামী। অধিকাংশই জোত আর রায়তী জমি। ভাগ্য ভাল—না হ'লে আবার মিনিষ্ট্রি জমিদার ওঠাচ্ছে, কি হ'ত বলা যায় না।—ভবিষ্যতের সমৃদ্ধির ছবি মুনীমজীর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সকলের অনুনয়ের কোন উত্তর না দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিতে চান—নেওয়া না নেওয়া তোমাদের ইচ্ছে, আমার ওতে কোন আগ্রহ নেই।

"তবে একটা কথা! জমি বিলি ব্যবস্থার কথা আসবে পরে। এখন যে এই সব শরণার্থীরা এত যে গরু-মোষ নিয়ে এসেছে, এতো যেখানে সেখানে চিরকাল চরতে পারে না। গেরস্তরা তা চরতে দেবেই বা কেন? এদের চরবার জন্য আমি মাসিক হারে জমি ব্যবস্থা করিয়ে দিতে পারি—সস্তায়; কিন্তু দেওয়া চাই নগদ।"

সকলেই একটা সমস্যার সুরাহা পেয়ে তাঁর চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়ায়। কার কাজ আগে হবে তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।

এদিককার এই জয়ধ্বনি পুলের ওপারেও চাঞ্চল্য জাগায়। "কি! কি ব্যাপার! নিশ্চয়ই কিছু ঘটে থাকবে। ঘাবড়াস্ না।"

টিনের চোঙটা হাতে নিয়ে একবাল চীৎকার করে "নারে তকদীর।" অপর সকলে বলে "আল্লাহো আকবর"—"মুর্দা না কি? জোরে বলতে পারিস না? ওপারের আওয়াজকে ডুবিয়ে দিতে হবে।"—হানিফ, একবাল, আরও কয়েকজন জয়ধ্বনির কারণ জানতে বেরোয়।—

"তোরা ততক্ষণ থামিস না যেন বুঝলি।"

"কে যায় গাড়ীতে?"

"শ্রীপুরের দর্পণ সিংএর জামাই আর মেয়ে।"

"সার্চ্চ কর গাড়ী, পাকিস্তান থেকে আবার কিছু মাল নিয়ে যাচ্ছে না তো!"

সঙ্গে সঙ্গে এরফান এসে পড়ে।—"কে, দিদিমণি? জামাইবাবু? —যেতে দাও গাড়ী। পালিয়ে যাচ্ছ কেন? আমরা থাকতে তোমাদের ভয় কি দিদিমণি? খোকাবাবু কত বড়টা হয়েছে দেখি। ভয় পাচ্ছে আমাকে দেখে। কিছু ভয় নেই দিদিমণি। মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে আবার এসো। তোমাকে তো, জামাইবাবু, ভেবেছিলাম মরদ। তুমি আবার পালাও কেন?"

জামাইবাবু আমতা আমতা করে। এরফান খোকার হাতে একখানা কাগজের তৈরী লীগের ঝাণ্ডা দেয়—"কেমন সুন্দর দেখতে, না খোকাবাবু?"

তারপর সঙ্গে গিয়ে গাড়ীখানা পুল পার করে দিয়ে আসে। বিদায় নেওয়ার আগে জামাইবাবুর সঙ্গে রসিকতা করে—"রাজা হেঁটে, আর পেরজা (প্রজা) গাড়ীতে।"

খবর জানার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণিয়া জেলার যেসব মুসলমান একখালের সঙ্গে ছিল, তারা ইজারাদারের উপর চটে আগুন হয়ে ওঠে।—ওটা চাঁদার টাকা নিশ্চয় খেয়েছে। আজকে ওটাকে ঠাণ্ডা করতে হবে—এখন আক্কয়াখোয়া কাছারিতেই আছে বোধ হয়। হিঁদুদের কাছ থেকে টাকা খেয়ে, ওদের দিকে রায় ক'রে দিলোনা তো? আজ রাতে এদিকে আসতে দে না।——

মুনীম সাহেবের খবরে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় দুই পারের লোকের মধ্যে। দর্পণ সিং-এর বুড়ো বাবাও জোর করে মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে—শ্রীপুর হিন্দুস্থানে আসবে এ দুরাশা যে ক'দিন জীইয়ে রাখা যায়। তার পরইতো সম্মুখে পড়ে আছে দুঃখ-বেদনাময় জীবন—যার সূচনা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে সেই পুল পার হওয়ার দিন থেকেই। দীর্ঘ জীবনের সুখ সমৃদ্ধির স্মৃতি, সব সেই দিন ওপারে রেখে এসেছে। এই বুড়ো বয়সে আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করা কি সম্ভব? আর, এই দেশে? এতটা বয়স হ'ল—'নাগর' নদীর পশ্চিমের দেশকে তারা জ্বরের দেশ বলেই জেনে এসেছে। আজ একে সোনার হিন্দুস্থান ব'লে জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ করে নাচার অসঙ্গতি বৃদ্ধের সংসারাভিজ্ঞ মনে খচখচ করে বেঁধে। কেন এমন হ'লো তা সে ভেবে কূলকিনারা পায় না।

সেবার 'নাগর' যখন ঘর-দোর ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তখনও মাচা বেঁধে বাঁধের রাস্তার উপর কতদিন কাটাতে হয়েছে; এপারে আসবার কথা কল্পনাতেও আনতে পারেনি।—কিছুক্ষণ ভাববার পর যেই এরফানের কথা মনে পড়ে, অমনি ব্যর্থ আক্রোশের বেড়াজালে, সকল যুক্তিতর্কের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

এই উত্তেজনার মধ্যে মুনীমজী ছ'খানা গাড়ী বোঝাই করে কি সব জিনিস এনেছে, সে কথা সকলে জিজ্ঞাসা ক'রতে ভুলে যায়।

মুনীমজীর হুকুম, আর পুলের এপার ওপারের লোকের মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটি নয়। পনরই দুই দিকেই প্রাণখোলা উৎসব করতে হবে, যা হওয়ার হয়েছে।

নিজে এগিয়ে ওপারের লোকের সঙ্গে মুনীমজী যেচে আলাপ করতে যান। এতদিন তিনি যেতেন পুলের মধ্যখানের 'নো ম্যান্‌স ল্যাণ্ড' পর্যন্ত। এখন যান একেবারে ওপারের ক্যাম্পে। সকলে বলাবলি করে—আলবৎ হিম্মৎদার লোক।

মুনীমজীর মধ্যস্থতায় দু'দিক্‌কার লোকের মধ্যে প্যাক্ট হয়, কোন দলই কারও সম্বন্ধে 'মুর্দ্দাবাদ' বলতে পারবে না—"আর পাকিস্তানের নতুন ঝাণ্ডা পেয়েছো তোমরা? না না এ নয়। এতো পুরানো, লীগের ঝাণ্ডা। নতুন ফ্ল্যাগের খবর রাখো না বুঝি? দরকার থাকে তো আমাকে বলো যত লাগে। সবরকম দামের আছে।"

এপারের লোকদেরও মুনীমজী হিন্দস্থানের নতুন ঝাণ্ডার কথা এতদিনে বলেন।

"সে এখন কোথায় পাওয়া যাবে?"

"সেকি আর আমি ব্যবস্থা করিনি? সবরকম দামের পাবে।"

সাধে কি আর লোকে 'মুনীমজী' ক'রে অস্থির হয়! যখন যেখানে যে জিনিসটার দরকার, মুনীমজীর তা নখদর্পণে।

উৎসব লেগে গিয়েছে রিলিফ ক্যাম্পের কাছে। কলকাতায় বিল্টু গাড়োয়ানের ভাই কাজ করতো পাটের কলে। সেখানে নাকি পনরই আগষ্ট খুব দাঙ্গা লাগবে, তাই সে বছর দশেকের ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। বাপ বেটায় দু'দিন থেকে রিলিফ সোসাইটীর ক্যাম্পে কাজ করে। কলকাতা ফেরৎ ছোকরা—অজ-পাড়াগাঁয়ের নিরীহ ছেলেদের উপর খুব মোড়লি করছে। ছেলেদের সে নূতন ভূত-ভূত খেলা শিখিয়েছে—অবিশ্যি আসলে খেলাটা শিখিয়েছে রিলিফের বাবুরা।

—একদল হয়েছে বেহ্মদত্যি, একদল হয়েছে মামদো ভূত। একদিককার নাম বেলগাছের দিক, আর একটা কবরের দিক; মধ্যেখান দিয়ে একটা কঞ্চির দাগের লাইন টানা। নোয়াখালিতে মরলে হবে বেহ্মদত্যি, বিহারে মরলে হবে মামদো। কবরের দিকে নূতন কোন খেলোয়াড় এলেই মামদোরা উল্লাসে নাকীসুরে চীৎকার করে "বিহার থেকে এসেছেরে"; আর বেলগাছের দিকে কেউ এলেই সকলে জিজ্ঞাসা করে "নোয়াখালি নাকি?" জবাব দিতে হবে, "না, চিৎপুর"——

ছেলেরা বিকৃত উচ্চারণে জায়গাগুলোর নাম নেয়। বড়রা সকলেই এই তামাসা দেখে, আর ছেলেদের এই কাণ্ড দেখে হেসে আকুল হয়।

মুনীমজী এসে সকলকে তাড়া দেয়, "এ সব কি হচ্ছে? আবার একটা গোলমাল পাকাবে নাকি? পালাও সব ছোকরারা, ফের যদি আমি এই দেখি, তাহ'লে তোমাদের সব কটাকে পুলের থেকে 'নাগরে'র মধ্যে ফেলে দেবো।"

তারপর রিলিফের বাবুদের বলেন, "আপনাদের কাছ থেকে আর একটু দায়িত্বশীলতার আশা রেখেছিলাম।" তারা অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

দুদিনের মধ্যে সব ঝাণ্ডা চড়া দামে বিক্রি হয়ে গিয়েছে। স্বজাতির লোকের ভয়ে ইজারাদার কোথায় যেন গিয়েছে—তার সেপাই বলে পাটনায়।

নিরবিচ্ছিন্ন উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে পনরই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। পুলের এপারে হিন্দুস্থানের পতাকা, ওপারে পাকিস্তানের ঝাণ্ডা। আতর গোলাপের ছড়াছড়ির মধ্যে পুলটা কেমন যেন অবাস্তব মনে হয়—খানিকটা পাকিস্তানে, খানিকটা হিন্দুস্থানে খানিকটা শূন্যে—। উৎসবের মধ্যেও এই পুলটির কথাই দর্পণ সিংএর মনে হয়।—সেও থাকে আরুয়াখোয়ায়, মন পড়ে থাকে শ্রীপুরের জমির

উপর। এই পুলটিই তার দেহ ও মনের সংযোগের সূত্র। এরই জন্য সময় মত এদিকে পালিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে; ভগবান যদি সুদিন দেন তাহ'লে এই দিয়েই আবার নিজের দেশে ফিরে যেতে পারবে। না ভগবান কেন, কমিশন। কমিশন কি ভগবানের চাইতেও বড় ?"...

দুই দিকের লোকের সম্মতি নিয়ে রিলিফের বাবুরা পুলের মধ্যেখানে ঝাণ্ডাভূতের খেলা দেখায়। ইংরাজের মড়াঝাণ্ডা জড়ানো ছেলের দল প্রথমে চোখ মুছতে মুছতে চলে যায়। তারপর লাগ আর কংগ্রেসের পতাকা জড়ানো ছেলের দলও চোখ মুছতে মুছতে চলে যায় মাতুমের গান গেয়ে। তারপর হিন্দুস্থান আর পাকিস্তানের নূতন জিন্দা ঝাণ্ডা নিয়ে দুদল ছেলে কোলাকুলি করে,—দর্পণ সিংএর বাবার মন একটু যেন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।...

শরণার্থীব দল ছাড়া আর সকলে বোধ হয় যখন কমিশনের কথা ভুলেছে, তখন হঠাৎ মুনীমজী খবর দেন, 'কমিশনের রায় বেরিয়েছে।" সকলে মুনাম সাহেবের কাছে ছোটে।

"শ্রীপুর এসেছে হিন্দুস্থানে।"

দর্পণ সিং মুনীম সাহেবকে জড়িয়ে ধরে। তার মা কি বোঝে না বোঝে, হাউ হাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করে। তার বাবা ভগবানকে আর কমিশনকে প্রণাম করে।—কমিশন তাহ'লে তার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন।—

"হরিপুর থানা পড়েছে পাকিস্তানে।"

"আর মালদা ?"

"তোমাদের দিকটা এসেছে হিন্দুস্থানে, শুকদেব। আর কি মেরে দিয়েছো।"

কপালে তিলক কাটা পোড়াগোঁসাই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন। এসেই প্রথমে রসিকতা করেন, "এই আসছি। গরুর গাড়ী থেকে নামবার সময় দেখি সিরি সাওয়ের দোকানের দেওয়ালে রং দিয়ে "কাপষ্টান" লেখা। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল। ছাঁৎ করে মনে হ'ল লিখেছে পাকিস্তান,—উর্দ্দুর উচ্চারণে উলটে। ভাবলাম তা'হলে আরুয়াখোয়া নিশ্চয়ই গিয়েছে পাকিস্তানে। তারপর শুনলাম ওটা এক রকম সিগারেট।—এখন আমার খবর বলুন মুনীমজী।"

মুনীমজী তার কথার জবাব ইচ্ছা করেই দেন না। রাজবংশীরা তাদের গুরুদেবের উপর মুনীমজীর এই ইচ্ছাকৃত তাচ্ছিল্যে আশ্চর্য হয়।

শেষ পর্যন্ত তাঁকে কুসংবাদ জানাতেই হয়। "জলপাইগুড়ি জেলার তিতলিয়া থানা চলে গিয়েছে পাকিস্তানে।"

"বললেই হলো? চ'লে গেলেই হলো আর কি।"

পরে তিনি লাঠিতে ভর দিয়ে খাটিয়ার উপর বসে পড়েন।—ভগবান এ তুমি আমার কি করলে—শেষকালে মরলে কবরে যেতে হবে।..মন্দিরে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। এও কি আমার কপালে ছিল।...

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার স্বস্তি পায় অধিকাংশ শরণার্থীরা। আবার সেই পুরাতন দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। একদিনের মধ্যে শরণার্থীদের ক্যাম্প ভেঙ্গে যায়। দূর দূর থেকে ফিরে আসে গাড়ী, মানুষ, গরু, মোষের মিছিল। গাড়ীগুলির উপর তিনরঙা ঝাণ্ডা লাগানো। মিছিলের লোকদের মধ্যে কারও কারও হাতে হিন্দুস্থানের পতাকা, মুখে রাজ্য জয় করে ফিরবার দীপ্তি। বাঘের মুখ থেকে বাঁচবার আনন্দে মেয়েরা মশগুল।...

—দ্রুতগতিতে চলছে দুনিয়া। এতকাল যাঁরা সৃষ্টি সংসার চালিয়েছেন, তাঁরা এত দ্রুত তালের কল্পনাও করতে পারেন নি। এত লোকের মন নিয়ে এমনভাবে ছিনিমিনি খেলতে সাহসও করেন নি।—সেই কথাই ভাবছে এক্‌বাল পুলের উপর থেকে পাকিস্তান ঝাণ্ডাটা নামাবার সময়।······দরকার কি ছিল ক'দিনের এই রাজত্বের? খাবার দিয়ে কেড়ে নেওয়ার প্রয়োজন কি ছিল? দু'শো বছর লেগে গেল ইংরেজের পতাকা সরাতে, আর তার ঝাণ্ডা সরাতে তিনদিনও সময় লাগলো না! মানসিক দুঃখ বেদনা তো এতে আছেই; কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা হচ্ছে যে এ অপমান রাখবার জায়গা নেই। পুলের উপর, পথের উপর শরণার্থীর সারি, ওপারে হাটশুদ্ধ লোক দেখছে।—মাথা কাটা যায় অপমানে, নদীতীরের বালির মধ্যে মিশে যেতে ইচ্ছে করে, নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। কত উৎসাহের সঙ্গে এই ঝাণ্ডা সে তুলেছিল। "তিনদিনের ভিস্তির বাদশাগিরি শেষ হ'লো"—রামজী সাওয়ের এ টিপ্‌পনি তার প্রাণের মধ্যে গিয়ে বেঁধে। এইখানেই এখনই ওরা ওড়াবে হিন্দুস্থানের ঝাণ্ডা। কিন্তু 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলে যে এই ঝাণ্ডার নীচে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করেছিলাম সে কি এই জন্য? কালই হয়ত শ্রীপুরের ছেলেরা এই ঝাণ্ডা নিয়ে এই পুলের উপর মড়াঝাণ্ডার ভূতের খেলা করবে। কার উপর অভিমান করবে—দুনিয়া যখন তার পিছনে লেগেছে···

কোন দিকে না তাকিয়ে এক্‌বাল ঝাণ্ডাটি নামিয়ে কাঁধে নিয়ে এগিয়ে যায়—উত্তরের দিকে—যেখানে এ ঝাণ্ডা এখনও মরে নি।

হানিফ নিজের নির্লিপ্ততা দেখানোর জন্যে বিড়ি ধরিয়েছিল। সে খাওয়ার আগে আধ খাওয়া বিড়িটা পুলের উপর ফেলে যায় আর

ভাবে এটা দিয়ে পুলটায় আগুন লেগে গেলে বেশ হয়।···আক্কয়াখোয়া আর শ্রীপুর আলাদা হ'য়ে যাবে তা'হলে।···সে জানে যে এ থেকে ঐ কাঠে আগুন লাগা সম্ভব নয়, তবু এটুকু ভেবেও আনন্দ পায়।

মুনীমসাহেব ওপারে ইজারাদার সাহেবের ক্যাম্প দখল করেন।

ছেলেরা পাটের ক্ষেত থেকে একটি পরিবারকে ধরে নিয়ে আসে, —কি মতলবে লুকিয়েছিল,—আগুন লাগাবে বলে মনে হয়—

"আরে অছিমদ্দী যে।"

অছিমদ্দী কেঁদে পড়ে।—"গাঁ থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলাম হরিপুরের দিকে। মীরপুর হিন্দুস্থান হয়ে গিয়েছে পরশু থেকে। শুনছি পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়ে নামাজ পড়াবে। মুর্গী জবাই করতে দেবে না। তাই এক কাপড়ে বেরিয়ে পড়েছি। ভাবলাম দিনমানটা পাটের ক্ষেতে থেকে, সাঁঝ হ'লে চলতে সুরু করবো"—সে কাঁদতে কাঁদতে মুনীম সাহেবের পা জড়িয়ে ধরে।

"ছেড়ে দাও একে। এরা আমার চেনা লোক।"

"দয়ার শরীর হুজুরের।"

"মুনীম সাহেব কী জয়।" "মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়!"—জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কেঁপে ওঠে।

মুনীমজী ওপারের সকল লোককে বলেন যে, "সকালে পাকিস্তান ফ্ল্যাগ আর রেখোনা। আমার কাছে দিয়ে দিও। আমি গভর্ণমেণ্টের কাছে জমা করে দেবো। হিন্দুস্থানে পাকিস্তান ফ্ল্যাগ রাখা বারণ"।

তাঁরই দেওয়া পাকিস্তান নিশানগুলি আবার তাঁর কাছে ফিরে আসে।

তিনি মনে মনে ভাবেন—এগুলি নিয়ে কাল যেতে হবে তিতলিয়ার দিকে। পোড়াগোঁসাইয়ের খালিবাড়ীতে উঠবেন, তাঁর জমিটমিগুলো একবার দেখেও আসবেন, সেখানে বেচতে হবে এই

পাকিস্তান ঝাণ্ডাগুলো। আর সেখানে যোগাড় করতে হবে সেখানকার প্রয়োজনীয় হিন্দুস্থান পতাকাগুলি। একই জিনিস দু' দু'বার করে বেচবেন। তিনি হিসেব করেন সব মিলিয়ে তাঁর কত হ'লো। "কমিশন" অনেককে অনেক কিছু দিয়েছে, আবার অনেক কিছু নিয়েছে। কিন্তু এই কমিশনের রায়ের, কমিশন বাবদ তাঁর প্রাপ্য তিনি পেয়ে গিয়েছেন। হিসেবে কোথাও ভুল হয় নি।...

ক্যাম্পের বাইরে থেকে ভেসে আসছে "মুনীম সাহেব কা জয়!"...একটু সন্দেহ মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করে...একটি খদ্দরের টুপি আগেই কিনে রাখলে, বোধ হয় আর একটু সুবিধে হত...হয়ত হিসাবে একটু সুবিধে হত...হয়ত হিসেবে একটু ভুল হয়ে গিয়েছে। যাকগে, রামজী যাকে যা দেন তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।...

মুনীমজী কুঠিয়ালা ভাষায় পকেটবুকে হিসাব লিখতে বসেন।

বন্যা

কুশীতে বান আসিয়াছে ; একরকম নোটিস না দিয়াই। নেপালে কোন্ পর্বত-শিখরের বরফ গলিয়াছে, হিমালয়ের কোন্ অরণ্যময় উপত্যকায় বারিপাত হইয়াছে, তাহার খবর কুশীর তীরের লোকেরা রাখে না। তাহারা খুঁজিতে আরম্ভ করে, কোন পাপে ভগবান তাহাদের এই শাস্তি দিতেছেন।

রহিকপুরা গ্রামের নিয়মানুসারে মেয়েরা সকলেই শেষ রাত্রেই ওঠে। তাহারা কেহই অঙিনার বাহিরে যাইতে পারে নাই ; কেহ কেহ আঙিনাতেও নামিতে পারে নাই।

তাহাদের চীৎকারে পুরুষেরা জাগে। কেহ লাঠি লইয়া ওঠে। কেহ বর্শা লইয়া আসে। সাপ বাঘ চোর, কত কি হইতে পারে। চোখের জড়তা ভাঙিবার পূর্বেই চন্দ্রগ্রহণের সময়ের মত, ঢাক, ঢোল শাঁখ-ঘণ্টা বাজিয়া ওঠে। দর্শন মড়র চৌকিদারের মত হাঁক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে। বিপদ-আপদের সময়, গাঁয়ের মোড়লদের প্রথমেই মোহন্ত রাঘোদাসের আস্তানের সম্মুখের আখড়ায় বিরাট লোহার গদাটী ঘিরিয়া বসিবার কথা।

কেরোসিন তেলের অভাব। কোন বাড়ীতে আলো ছিল না। কেবল একটি দুইটি বাড়ীতে প্রদীপ জ্বালানো হইয়াছে। মড়রের[১] এতটা অভাব নাই। আখড়ায় পৌছানো শক্ত। রাস্তা দিয়া জলের স্রোত বহিতেছে। খুঁটিতে বাঁধা গরুগুলি চীৎকার করিতেছে।

মেয়েরা আঙিনায় বলে, "ওমা, জল যে বারান্দায় উঠে আসছে।" চোখের উপর দেখিতেছে এই দাওয়ায় উঠিবার দ্বিতীয় সিঁড়ি ডুবিল। আরও এক আঙ্গুল বাড়িয়াছে।

"মজা দেখছিস কি! ঘুঁটে কখানা তোল্। কাঠগুলো উপরে ওঠা।"

ভুষির জালাগুলো কি করিয়া সরান যায়। কাঁচা মাটির বিরাট বিরাট জালা। জল লাগিলেই গলিয়া যাইবে।

"ছাগলটি কোথায়?"

"গে মাই! তুলসী গাছটী যে এরই মধ্যে ডুবে গেল।"

"রান্না ঘরের উনুন যে গেল ডুবে। উখলিটী[২] ভেসে চলল। কি হবে গো!"

"আঃ! কি হল্লা কর। যত মেয়েছেলের কাণ্ড! সরো। মাচা বাঁধতে দাও।" তিন হাতের খুঁটি কাটবি। বেশি হ'লে ক্ষতি নেই—কম যেন না হয়।"

"কৌশিকী মাঈকি জয়!" মোহন্তজি প্রত্যহই প্রত্যুষে দুবার এই জয়ধ্বনি করেন পূর্বাকাশের দিকে তাকাইয়া। খলিফা[৩] আর গ্রামের জোয়ানেরা ল্যাঙ্গোটা পরিয়া আখড়ায় আসিবার জন্য তৈরি হয়। আজ কাহারও উৎসাহ বা সময় নাই; কিন্তু এই জয়ধ্বনি আজ নূতন ঝংকারে সকলের কানে বাজে। ক্রুদ্ধা কৌশিকীমাতাকে শান্ত করিবার জন্য মোহন্তজি যেন মন্ত্র পড়িতেছেন। গ্রামের আবাল

---

(১) মোড়ল (২) উদূখল (৩) পালোয়ান

বৃদ্ধ সকলে এই সুরে সুর মিলায়।—"কে অস্বীকার করছে মা, তোমার ক্ষমতা। আমাদের উপর সদয় থেকো মা।"

কোন বিশাল নৈসর্গিক বিপদের সময় ছাড়া রহিকপুরা গ্রামের সকলে একমত কখনও হয় নাই। একখানা ঢোল বাজিতেছে মোহন্তের আস্তানে। ঢুলহা মাঝির ছেলে সাঁওতাল টোলায় একখানা কড়া বাজাইতেছে—ডুম্ ডুম্ ডুম্। মহরমের ঢোলের মত ফৌজী তাল। জাগো, জাগো, কেবল তাতেই চলবে না; সাজো সাজো; আর এক মুহূর্তও দেরী করা নয়। চ'লে এস ঘরে, মকাই খেতের মাচার উপর থেকে; চলে এস ঘরে বীচদরিয়ার ডিঙির উপর থেকে। গরু মোষ শুয়োর ছাগল লইয়াই মুশকিল। জানের আগে মাল সামলাও।

একেবারে তছনছ কাণ্ড। এক মুহূর্তে এই জগৎটির উপর কি করিয়া এত ব্যাপার ঘটিয়া গেল!

সবাই উঁচুতে থাকিতে চায়। আরও উঁচুতে উঠিতে চায়। উঁচুতে জিনিসপত্র রাখিতে চায়। আকাশে যদি শিকে ঝুলানো যাইত!

গ্রামে কাহারও নৌকা নাই। এইরূপ বান এদিকে নিয়মিত হয় না। তাই কেহই ইহার জন্য তৈরী নয়। সাম্রতি তিম্বরের কেবল একখানি ডিঙি আছে—ওপারের চর ও ভুখনাহা দিয়ারা হইতে গরুর খাইবার ঘাস আনিবার জন্য।

মুসহরটোলা গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে নীচু জায়গায়। মুসহরটোলার কুটিরগুলি প্রায় ডুবিল বলিয়া। তাহারা অন্য পাড়ায় এক-এক ক'রিয়া আসিয়া জোটে। মাচা তৈরি করা সেখানে বৃথা। একটি ছাগল স্রোতের মুখে ভাসিয়া গেল। ধর্ ধর্! তাহাকে কোলপাঁজা করিয়া গেনুয়া মুসসর আগাইয়া আসে। তাহাদের জিনিসপত্রের

মধ্যে তো হাঁড়িকুঁড়ি, উখলি সামাটু। কোন্ স্থানেই বা তাহারা এক নাগাড়ে বেশি দিন থাকে? কোন রকমে মাথা গুঁজিবার স্থান সেদিনটার মত হইলেই হইল। কথায় বলে, "এক কাঠা ভুট্টার দানায় মুসহর রাজা।"

কতক লোক উঠিয়াছে নৌথে ঝার উঁচু দাওয়ায়; কতক সুমৃৎ তিয়রের বৈঠকে। গেন্নুয়া মুসহরের স্ত্রী চীৎকার করিয়া ওঠে, তাহার পঙ্গু ছেলেটিকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। গেন্নুয়া আবার এক কোমর জলে নামিয়া পড়ে ছেলে খুঁজিতে। বারান্দার অন্যান্য মুসহরেরা ভাবে, যাক ছাগলটা ভালোয় ভালোয় গেন্নুয়া আনিয়া পৌঁছাইয়াছে।

একে একে দুইটি বাড়িই ভরিয়া গেল। তিল ধরানোর স্থান নাই। নৌথে ঝা আর সুমৃৎ তিয়রের পরিবারের মধ্যে রেষারেষি, ঝগড়া, ফৌজদারি নিত্য লাগিয়াই আছে। প্রথমে ছিল দুই জনের পিতাদের মধ্যে ব্যক্তিগত; পরে হইয়া দাঁড়ায় ব্রাহ্মণ ও তিয়র দুই জাতির মধ্যে কলহ।

বহু বৎসর পূর্বের ঘটনা। সুমৃতের পিতা তাহার এক মৃগীরোগগ্রস্ত আধিয়াদারকে সামান্য প্রহার করিবার পর সে অজ্ঞান হইয়া যায়। তাহার মূর্ছাভঙ্গ আর হয় নাই। নৌথের বাবা থানায় খবর দিয়া নাকি আসামীকে ফাঁসি দেওয়াইবার চেষ্টা করে। দুই বৎসরের সাজা হয়। সেই সময় নৌথের বাবা যখনই সদরে যাইত, তখনই ভাঁড়ে করিয়া তাহা সরিসার তেল লইয়া আসিত। বলিত, "জেলখানার তেল।" গ্রামের লোকের সম্মুখে তেল মাখিবার পূর্বে, তিনবার অশ্বত্থামার নাম লইয়া শুঁকিয়া মাটিতে ফেলিত আর বলিত, "বড় বাড় বেড়েছিল; তাই একটু একটু ক'রে তিয়রের তেল বের করছি।"

সেই হইতে আরম্ভ; এখনও চলিতেছে। এখনও দুই পরিবারের লোকেরা পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা বলে না। সুমৃৎকে দেখিলে নৌথে ঝা শব্দ করিয়া থুতু ফেলিয়া অন্য পথে চলিয়া যায়। সুমৃৎ দাঁত কড় কড় করিয়া নিকটস্থ মহিষের পিঠে জোরে লাঠি দিয়া মারে—"শালা পথ জুড়ে বসে আছে।"

কুশীর দুকূলভাঙা প্লাবনের মুখেও মাতব্বরদের কর্তব্য তো করিতেই হইবে। তাই নৌথে ঝা পুরুবটোলায় লোকদের অবস্থা তদারক করিতে গিয়াছেন—কোন কাজের শৃঙ্খলা যদি থাকে এই পাড়ার লোকদের! তুরিয়া বাঁতার এই সময়েও মোটা সুতায় বাঁধা বঁড়শির সহিত প্রকাণ্ড একটি ছাল-ছাড়ানো সোনাব্যাঙ গাঁথিতেছে। নৌথে ঝা জিজ্ঞাসা করে, "কিরে তোরা জিনিসপত্র সামলেছিস ?"

"আমার পুতহু[১] আছে সেয়ানা" । সে আর বেশী কথা খরচ না করিয়া সুতাটিকে একটি বাখারির সহিত বাঁধিতে থাকে।

পচ্ছিমটোলায় সুমৃৎ তিয়র এক বুক জলে দাঁড়াইয়া চীৎকার করে—"মাল পেলে মাল আবার হবে; জান গেলে কিন্তু জান আর ফিরে পাওয়া যাবে না। ওরে পাতরঙ্গী, তুই আবার চালের উপর উঠছিস কেন? লাউ—কটা পাড়বি? এখন আর লোভ করিস না। ও কি! আবার পুঁটলি ওঠাচ্ছিস যে চালের ওপর। ছাগলটাকেও যে টেনে তুললি। মরবি, মরবি।"

পাতরঙ্গী জবাব দেয় না। শতছিন্ন শাড়ীটি মাথার উপর একটু টানিয়া দিয়া, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বসে। ভাদ্দরের রোদবৃষ্টির মধ্যে, কি করিয়া চালের উপর তাহার দিন কাটিবে, সে-কথা সে ভাবে না। তাহার বাড়ি ছাড়িয়া সে এক পাও নড়িবে না।

(১) পুত্রবধূ

"যা, সব গরু মোষগুলো নিয়ে রেল-লাইনের উপর যা। রেল লাইনটা উঁচু আছে, এখনও ডোবেনি।"

সকলে একে একে গ্রামের উঁচু স্থানগুলিতে আসিয়া জুটে। উচ্চবর্ণেরা উঠিয়াছে নৌখে ঝার বাড়িতে। নিম্নবর্ণেরা উঠিয়াছে সুমৃং তিয়রের বাড়ি। মুসলমানরা উঠিয়াছে মসজিদের বারান্দায়। বহুকালের পুরানো পাথরের মসজিদ, আগে নদীর ওপারে ছিল। নদী সরিয়া যাওয়ায়, এখন এপারে হইয়া গিয়াছে।

প্রথম আলোড়নের পর পরিস্থিতি থিতাইয়া আসিয়াছে। প্রাণে সকলেই বাঁচিয়া গিয়াছে। এখন থাকিয়া গেল প্রাণধারণ করিবার প্রশ্ন। তিয়রের বাড়ির মেয়েরা, অন্য ভদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য উঠানে ভাত রাঁধিতেছেন। এক প্রতিবেশিনী সাহায্য করিতেছে। আঙিনার আর-এক স্থানে দুইটি মুসহর স্ত্রীলোক ইট দিয়া তৈরি উনুন ধরাইতেছে। তাহারা আজ আবার ঘোমটা দিয়াছে। তিয়র-গিন্নী এক ঝুড়ি ভুট্টা আনিয়া সেখানে দিলেন। মুসহর মেয়েরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিল "আমরাও বাড়িতে ভাত খাই। এখন ও চাল বাঁচাচ্ছে কার জন্যে বুঝি না। বাড়ির আঙিনায় যখন পেয়েছ, যত ইচ্ছে অপমান ক'রে নাও। নিজেদের কথা হলে ভাবতামও না। ঐ ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো খাই খাই ক'রে জ্বালাতন করে, আর ঐ বেচারারাই বা করবে কি? পাশেই গেরেস্তদের ছেলেদের ভাত খেতে দেখলে, তারা কি চুপ করে থাকতে পারে?"

ধাঙড়, মুসহর, বাঁতার, সকলেরই আলাদা আলাদা 'চৌকা' হইল। গেরস্ত বাড়ির লোকেরা খাইতে বসিল বাড়ির আঙিনায়; মুসহর, ধাঙর, বাঁতার, তাৎমারা বাহিরের বৈঠকখানায়।

বেশ একটা চড়াইভাতির মনোভাব। তাহার পর চলে একটানা

কুশীর বান দেখা। কালো জল—গঙ্গার জলের মত ঘোলাটে সাদা নয়। হুড়াহুড়ি করিয়া একসারি ঢেউ, আর এক সারিকে তাড়া করিয়াছে। তীব্রগতির তোড়ে একটি বিরাট গাছের গুঁড়ি উষ্ট্রারোহীর মত সামনে পিছনে দুলিতে দুলিতে, চোখের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। গরু ভাসিয়া যাইতেছে—মরা না জ্যান্ত? নামব নাকি—জয় কৌশিকী মাইকী জয়। না, নামা বৃথা। ওটি বোধ হয় নীলগাই। কুমীরে প্রকাণ্ড একটি মাছ ধরিয়াছে। জলের উপর ছুটোপুটি করিতেছে। যাক, মাছটি পলাইয়াছে। ওটা কিন্তু আর বাঁচবে না—ধরার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাপটায় নিশ্চয়ই ওটার হাড়টাড় ভেঙে দিয়েছে।

বন্যার জলের উত্তাল কল্লোলধ্বনি সকলেরই কানে সহিয়া গিয়াছে। সূর্যের কিরণ ঢেউয়ের উপর পড়ায় সে দিকে তাকান যায় না। একটি চালা ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার উপর তিনজন লোক পরিত্রাহি চীৎকার করিতে করিতে চলিয়াছে।—কি বলিতেছে বুঝা যায় না; না বুঝা গেলেও আন্দাজ করা যায়। চালার চতুর্দিকে সর্পিল ঢেউয়ের রাশি আছাড় খাইয়া পড়িতেছে; ফণা তুলিয়া সহস্র মুখ বাসুকি শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। এক রাশ সাদা আলোকময় বারিকণা চালাটিকে ভিজাইয়া দিল।

পিছনে একটি শব দেহ আসিতেছে তীব্র গতিতে। একটি কাক চোখমুখের উপর ঠুকরাইতেছে।

সুমৃৎ তিয়রের দাওয়ার নীচেও ঢেউ লাগিতেছে—ছলাৎ-ছল্ ছলাৎ-ছল্ মধুর মনোরম ছন্দে। এ আঘাতে প্রচণ্ডতা নাই, মাটির চাপ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার, অশথগাছ ভাসাইয়া লইবার উগ্র উদ্দণ্ডতা নাই। রণচণ্ডিকা কৌশিকী মাঈ, অভয় হস্ত বুলাইয়া তিয়র শিশুকে ঘুম পাড়াইতেছেন। ওপারে ভুখনাহা দিয়ারার

দক্ষিণের পাহাড় অল্প অল্প দেখা যাইতেছে। এর মধ্যেও 'আধেঙ্গা' হাঁসের দল পশ্চিমে উড়িয়া চলিয়াছে। এখানে বৌনী বাঁতারের আর মসজিদের বারান্দায় কুদরতি গিঞার শিকারের হাত একই সঙ্গে নিশপিশ করিয়া উঠে।

দিনের পর রাত আসে, আর রাতের পর দিন।

একগলা জল বহিয়া পশ্চিমের উঁচু ঘরের বারান্দা হইতে আধশুকনো মকাই লইয়া আসা হয়।

"দেবীস্থানের পশ্চিমের নীচু জমিটায় এবার সাড়ে তিন বিঘা অঘানী ধান লাগিয়েছিলাম। এই এক—এক হাত হয়েছিল।"

"আমি তো বাঁতারটোলার পাশের দহের ধারের ধান, তৈরী ভাদই ধান, তুলতেই পারলাম না। সারাবছর বালবাচ্চারা কি যে খাবে।"

"যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই খাওয়াবেন।" সকলেই শেষ পর্যন্ত এই কথাই বলে; কিন্তু কথাটি যেন অন্তরের ভিতর হইতে আসেনা; মন মানিতে চায় না।

"সুমৃতের সাত শো বিঘা ধানের খেত ডুবেছে, পাঁচ শো বিঘা ভুট্টার খেত।"

"নৌখে ঝার বারো শো বিঘা ধানের খেত, আর সাত শো বিঘা মকাইয়ের ক্ষেত।" "নৌখের বেলায় ছোটকী বিঘা দিয়ে মাপছিস নাকি—সাড়ে চার হাতের লগার বিঘা?"

"প্রায় অর্ধেক মকাই কিন্তু আগেই ঘরে তোলা হয়েছিল।"

"তোলা হয়েছিল তো তোলাই থাকল।" সকলে হাসিয়া উঠে। "মকাই হয়েওছিল তো ভারি। বর্ষাতে জল বসে সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ভাবছিলাম গাছগুলো কুটি-কেটে গরুকে খাওয়াব; তাও কৌশিকী মাঈয়ের দয়ায় হল না।" সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া

উঠে। কেহ বাধা দেয় না, বারণ করে না। একই ব্যথা সকলের। একজনের অশ্রুর ভিতর দিয়া সকলের অব্যক্ত বেদনা প্রকাশ পাইতে চায়।

জল কমিবার নাম নাই। এরূপ করিয়া আর কতদিন চলে। তিন দিন তো হইয়া গেল। আজ জেলে-ডিঙিতে করিয়া পাতরঙ্গী ও তাহার ছাগলটিকে এখানে আনা হইয়াছে। সেই চালার উপর দুইটি সাপ উঠিয়াছিল। তাহারা মানুষ দেখিয়া নড়ে না; তাড়া দাও হাততালি দাও, সরে না—কেবল পিট্ পিট্ করিয়া তাকায়। ভয়ে পাতরঙ্গী চীৎকার করে।

ছেলেপিলের চ্যাঁ ভ্যাঁ। নোংরা ঝার বারান্দা ও আশেপাশের সব জায়গাই নরক হইয়া উঠিয়াছে। ঘাসপাতা পচার গন্ধও আকাশে বাতাসে সর্ব্বত্র।

নদী দিয়া কোন নৌকা গেলেই বারান্দার লোকেরা তাহাদের ডাকে—চীৎকার করিয়া, হাতছানি দিয়া, গামছা উড়াইয়া। কিন্তু গরু ছাগল ধান ছেলেমেয়ে ভরা নৌকাগুলি ফিরিয়াও তাকায় না। কোনটিতেই তিলধারণের স্থান নাই।

হতাশার গ্লানিতে যখন লোকের মন ভরিয়া গিয়াছে সেই সময় হঠাৎ দেখা যায় একখানি হাজারমনী নৌকা। "এই দিকেই তো আসিতেছে।" তাহা হইলে কি শেষ পর্যন্ত কৌশিকী মাঈয়ের দয়া হইল! জয় কৌশিকী মাঈ কি জয়! ছেলে-বুড়ো সকলে উঠিয়া দাঁড়ায়। নৌকা হইতে গান্ধীটুপি-পরা ছেলে চ্যাঁচায়—"আগে বাচ্চারা আর মায়েরা। পরের দলে আসবে পুরুষেরা। যাবে গঞ্জের বাজারে। সেখানে আশ্রয়-প্রার্থীদের জন্য ক্যাম্প খোলা হয়েছে। বানের জল আবার বাড়বে। কাদার দেওয়াল ধ্বসে পড়বে। তার আগেই সকলে চলে এসো, চলে এসো,—দেরি কোরো না।"

মেয়েরা বলে, "আমরা একা যাব নাকি? তার চেয়ে এখানে মরা ভালো।" বলে, আর যে যার আমসি আচার আর বড়ির পুঁটুলি গুছায়।

"আচ্ছা, তাহলে একজন দুজন বেটাছেলে আসুন।" একে একে নৌকায় লোক ওঠে। ছোট ছেলেরা মুখে আঙুল দিয়া হাসে। মেয়েরা চোখে আঙুল দিয়া জল মোছে। পুরুষেরা উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকায় আর বলে, "ভাবিস না, আমরাও আসছি।"

"এটা নৌখে ঝার বাড়ি না? আসুন, আপনারাও আসুন।" "নৌকায় কারা? মুসহর ধাঙ্গড়ের মেয়েরা? সুমৃতের লোকেরা? আমাদের ব্রাহ্মণ মেয়েরা পরের নৌকায় যাবে। না, না, ভয় পাচ্ছি না। আপনারা মহাত্মা। আপনাদের সঙ্গে পাঠানোতে আবার ভয় কিসের? কথাটা অন্য।" গান্ধীটুপি-পরা ছেলেরা তাড়া দেয়, বচসা চলে, তাহার পর ব্রাহ্মণ বাড়ির মেয়েরা একে একে নৌকায় ওঠে, মুসহর মেয়েরা সরিয়া তাহাদের জন্য আলাদা জায়গা করিয়া দেয়, সুমৃতের বাড়ির মেয়েরা কুশীর অন্য পাড়ের পাহাড়ের গাছগুলি গুনিবার চেষ্টা করে।

"পুরুষদের মধ্যে থেকেও দু'একজন আসতে পারেন; পরের ব্যাচে বাকি সকলে যাবেন। ততক্ষণ কিছু ভুট্টার ছাতু দিয়ে যাব নাকি?"

"চাল আছে নাকি? ভুট্টার দরকার নেই। কেরোসিন তেল আছে? পোকা-মাকড়ের মধ্যে রাত-বিরেতে দরকার হয়। সরসের তেল? নুন? দেশালাই? পাঁকুইএর ওষুধ? কিছুই নেই?"

"না, আমরা রিলিফ পার্টির লোক না—রক্ষা-পার্টির লোক। রিলিফ দিতে আসিনি, লোকের প্রাণ বাঁচানোর জন্য এসেছি।"

"না না, ভুট্টার কথা বললেন কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

স্রোতের বিরুদ্ধে নৌকা চলে। চলিতে আর চায় না—হাওয়া থাকলেও, না হয় পাল তুলিয়া দেওয়া যাইত।

"হরিণকোল সড়কের পাশ দিয়ে নিয়ে যাবি।" হরিণকোল সড়ক ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা, হরিণকোল পর্যন্ত গিয়েছে। রাস্তা কোথায় ছিল কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। কেবল রহিকপুরার পশ্চিমে যেখানে ভীষণার নালী আসিয়া কুশীতে পড়িয়াছে, সেইখানে ভীষণার উপর একটি পুল ছিল। পুলের রেলিঙের উপরাংশ দেখা যাইতেছে।

গোবরাহার নিকট পৌছিতেই সাড়ে চার ঘণ্টা লাগিয়া গেল। এখানে জলে একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণী; বিরাট পরিধি লইয়া সাদা ফেনিল আবর্ত্ত। নাম কালভৈরোকা কুণ্ডী। কালভৈরব দুধ দিয়া সিদ্ধির সরবৎ তৈয়ারি করিতেছেন; আঙুল দিয়া নিচের থিতানো চিনি, সিদ্ধিবাঁট দুধের সহিত মিশাইতেছেন। নৌকার সকলেই তাহা জানে এবং সেইজন্য এখানে প্রণাম করে—রক্ষা করো আমাদের কালভৈরব! এই জলের নাগরদোলায় অনবরত ঘুরপাক খাইতেছে একটি কলা গাছের ডোঙা, কয়েকটি পোড়াকাঠ, একটি কলসী, আর ফেনার সহিত রাশীকৃত আবর্জ্জনা।

"সামুহালকে! বাঁয়ে দাব্ কর্ চলো।" হঠাৎ নৌকাটি অসম্ভব দুলিয়া উঠে। একদিকে কাত হইয়া যায়। মেয়েরা আর ছেলে-পিলেরা চীৎকার করিয়া এ ওর গায়ে গিয়া পড়ে। তাহার পরই নৌকাটি অন্য দিকে কাত হয়। নৌকার ভিতর সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। মায়েরা ছেলেদের বুকে চাপিয়া ধরে। নৌখে ঝার স্ত্রী আসন্ন প্রসবা পুত্রবধূকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকে। সুমৃৎ তিরয়ের স্ত্রী ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া একেবারে ব্রাহ্মণদলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। সে হঠাৎ নৌখে ঝার পুত্রবধূকে কাঁধ ধরিয়া বসায়। শাশুড়ী বৌ দুজনকেই বলে, "ভয় কি! কৌশিকী মায়ের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে।" সেও পাশে বসিয়া নৌখের পুত্রবধূকে

ধরিয়া থাকে—আহা, বৌটি এখনো ভয়ে কাঁপছে। মাঝিরা চীৎকার করে, ‘কালভৈরো কী জয়!’

“নৌকোর একদিকে সবাই কেন? মেয়েদের কি কোনো কালে আক্কেল হবে!”

আর-একজন মাঝি বলে, “হাজারমনী নৌকো ব’লে বেঁচেছে। না হ’লে এখনই কালভৈরোর ভাঙের গোলমরিচ হয়ে যেত।”

‘আর খানিকটা!’ ‘জোরে!’ ‘দাঁড় বন্ধ কোরোনা ভাইয়ো!’ বাস! আর এক কোশ!’

গঞ্জের বাজার। সেদিকটা উঁচু। তাই সেখানে জল পৌঁছায় নাই। সেখানে আশ্রয়প্রার্থীদের একটি ক্যাম্প খোলা হইয়াছে। চৌবেদের আমবাগানে বার্মা ইভ্যাকুয়ীদের জন্য যে ক্যাম্প হইয়াছিল, তাহারই অবশেষ এখনও সেখানে নড়বড়ে অবস্থায় দাঁড়াইয়া ছিল। চালের খড় উড়িয়া গিয়াছে। এক কোণে একটি কুষ্ঠ রোগীর কালো ঝুলমাখা মাটির হাঁড়ি বাঁশের সহিত ঝুলিত; আর রাজ্যের গরু ছাগল এখানে থাকিত। তাহাই এই চার বৎসর লোকে দেখিয়া আসিতেছিল। আজ হঠাৎ ইহার গালভরা নাম দেওয়া হইয়াছে—‘রিফিউজি ক্যাম্প’।

মেয়েদের আনিয়া এখানে নামানো হইল। আরও দূরদূরান্তর হইতে লোক আসিয়াছে। দেখিয়া মনে হয় যেন কোনো যোগের সময়ের গঙ্গার ঘাটের ভিড়—“বান তো সোজা হয় নি। ফুলকাহা থেকে বাঘডোবরা—সাতাশ মাইল। কত গাঁ যে ভেসেছে তার কি ঠিক আছে।” তাই এই ভিড়। তবু তো কত লোক ধর্ম্মশালায় আছে; কত লোক এখানে বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে।

এখানে এক-এক গাঁয়ের লোক, এক-এক দিকে জায়গা দখল করিয়াছে।

"আপনারা কোথাকার—ফুলকাহার নাকি? আপনারা? আর আপনারা?"

মোটামুটি আলাপ-পরিচয় জমিয়া ওঠে। তা কেবল মৌখিক। হাজার হইলেও তারা ভিন্‌গাঁয়ের লোক, নিজের গাঁয়ের লোক হইল আপনার জন।

"আর চাটাই চাই এখানে—চাটাই!"

ভলন্টিয়ররা চেঁচায়, "কটা উনুন হবে? চারটে? স্লিপ নেন। রিলিফ আপিসে যান। ঐ যে নিশান টাঙানো—গেটের পাশে গরু শুয়ে রয়েছে—ঐ বাড়িটা। ঐখানে ইট পাবেন।"

"কে কে যাবে ভাই, ইট আনতে?" ঝা-গিন্নী, তিয়র-গিন্নীকে জিজ্ঞাসা করেন।

সঙ্গে সঙ্গে "মুসহরনীরা বলে, "আমরা আনবো"; সাঁওতালনীরা বলে, "আমরা আনবো।"

"তোমরা কি মা এসব কাজ করতে পার, না কোনো দিন করেছ। আমাদের গাঁয়ের ইজ্জৎ খ্যাতি আমাদের হাতে। তোমাদের কিছুতেই যেতে দিতে পারিনা।"

সব দরকারী জিনিসই বাহির হইল—মায় শিলনোড়া পর্যন্ত। সাঁওতালনীরা ছাড়া আর সকলেই বলে, আমরা বামুনের হাতের পেসাদ পাবো। ব্রাহ্মণীরা হাসিয়া উনানের দিকে যান। তিয়র মহিলারা মশলা বাঁটিতে বসে।

ছোট ছেলেদের আগে খাওয়াইয়া দেওয়া হইবে। দিয়াছে ভুট্টার ছাতু। তিয়র মেয়েরা ছাতু মাখে, ব্রাহ্মণীরা রুটি সেঁকেন।

সুমৃতের স্ত্রী নৌখের স্ত্রীকে বলেন, "দিদি ঐ কচি পোয়াতি বৌটাকেও এখনি বাচ্চাদের সঙ্গে খাইয়ে দাও। কম ঝক্কি তো গেল না ওর-উপর আজ। এখন সবই ভগবানের কৃপা।"

বৌ ঘাড় নাড়িয়া এখন খাইতে আপত্তি জানায়। ঝা-গিন্নী হাসিয়া বলেন, "দেখলে তো আমার বৌয়ের ঘাড় নাড়া। আর, একবার যে ঘাড় নেড়েছে, আর ওকে 'হাঁ' বলাও তো।"

তিয়র-গিন্নী বলেন, "এই জিনিসই তো ভালবাসিনা বৌমা। যা বলি তাই শোনো, 'না' কোরো না। তাহ'লে বড্ড রাগ করব কিন্তু, মা।"

বৌ শালপাতা লইয়া বসে।

শাশুড়ী একগাল হাসি মুখে লইয়া বলেন, "এ আজ আজব কাণ্ড দেখালে বহিন।"

বড়দের খাওয়া দাওয়া চলিতেছে। ইতিমধ্যে আর দুইখানি নৌকায়, গ্রামের পুরুষেরা ও মসজিদের বারান্দার লোকেরা আসিয়া পড়ে। ছেলেদের অধিকাংশই শুইয়া পড়িয়াছে। যাহারা জাগিয়াছিল তাহারাই পেট্রোম্যাক্সের আলোতে প্রথম চিনিয়াছে আত্মায় পরিজনকে।

ব্রাহ্মণ মেয়েরা থালা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়ে। অন্য জাতের মেয়েরা ঘোমটা টানিয়া হাত গুটাইয়া বসে। সাঁওতালনীর সাঁওতালদের দিকে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে দুই হাত দিয়া মকাইয়ের রুটি খায়।

মসজিদের দলের লোকদের মধ্যে অধিকাংশই শীর্ষাবাদিয়া মুসলমান—এদেশে বলে 'বাধিয়া'। ইহাদের বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদ জেলায়। মাছের মতই যেন ইহারা জলের জীব। গঙ্গাতে যেখানে চড়া পড়ে সেখানে তাহারা হানা দেয়। এমনি করিয়া দলে দলে রাজমহলের গঙ্গার পথে বিহারে আসিয়া এ অঞ্চল ছাইয়া ফেলিয়াছে। ইহারা নাকি মুর্শিদাবাদের নবাবের হাবসী সৈন্যদের বংশধর। তাই জলের ধারে থাকিলেও ইহাদের রক্ত এখনও গরম। হাসিমস্করা

করিতে করিতে হঠাৎ চটিয়া রামদা লইয়া মারিতে যায়। এদের মোড়ল মনিরুদ্দি শীর্ষাবাদিয়া সঙ্গের মেয়েদের একদিকে জায়গা দেখাইয়া দেয়। তাহার পর ব্রাহ্মণ আর তিয়রদের বলে, "চলুন, আমরা বেটাছেলেরা সব একটু বাইরে ঘুরে আসি। দেখছেন না, নইলে মাঠাকরেনদের খাওয়া হবে না।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তাইতো" বলিয়া নৌখে ঝার সহিত সকলে বাহির হইয়া যায়। মেয়েরা আবার খাইতে আরম্ভ করে। ভিনগাঁয়ের বেটা ছেলের সম্মুখে খাইতে আবার লজ্জা কি? তাড়াতাড়ি সকলে খাওয়া দাওয়া সারিয়া লয়। আবার উনুনে ফুঁ দেওয়া আরম্ভ হয়।

ফুলকাহার দলের এক বর্ষীয়সী মহিলা বলেন, "এদের রান্নাবাড়ার কি আর বিরাম নেই?"

রহিকপুরার ব্রাহ্মণ, তিয়র, শীর্ষাবাদিয়া, বাঁতাব সব মহিলাই এক সঙ্গে বলিয়া ওঠে—'তাতে আপনার কি হচ্ছে', 'আমরা সারা রাত রাঁধব' 'বাড়িতে আমরা খেতে পাই না, এখানে এসে ছুটি পাচ্ছি। না ভাই, তাই না?' আরও কত মন্তব্য তাহারা বৃদ্ধাকে উদ্দেশ করিয়া বলে। বৃদ্ধা ঘুমাইয়া পড়িবার ভান করে।

"নিশ্চয়ই গোবরাহায় বাড়ি।" রহিকপুরার সব মেয়েরা একসঙ্গে হাসিয়া উঠে। এ অঞ্চলে গোবরাহার লোকদের বোকা বলিয়া দুর্নাম আছে।

পরের দিন।

সকলেরই মন ভারাক্রান্ত। ক্ষতির পরিমাণ এই কয়দিন কেহই ভাবিবার সময় পায় নাই। নদীরও কূল-কিনারা নাই; দুরদৃষ্টের কথা ভাবিয়াও কূলকিনারা পাওয়া যায় না। বাড়িটি এখনও দাঁড়াইয়া আছে কিনা কে জানে।

ডাকবাংলাতে জেলা হইতে হাকিম আসিয়াছেন। কোথাকার এক ছোকরা কুশী নদীর ভয়ানক বানের কথা কাগজে ছাপাইয়া দিয়াছে। সম্পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞানহীন ছোকরা। আবাব লিখিয়াছে, "নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র"। একখান রদ্দী কাগজ—তাতেই আবার লেখা "জাতীয় দৈনিক পত্র"। উহা দেখিয়াই জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। এতক্ষণে হয়তো উপর হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে। কাল হয়তো জেলা-কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাব খবর-দেওযা কাগজের কাটিং সেক্রেটারিয়েট হইতে কৈফিয়ৎ তলব করিয়া কলেক্টরীতে আসিয়া যাইবে। একটু নিশ্চিন্ত হইয়া চাকরি করিবার কপাল আর আজকাল নাই।

কেবানীবাবু আসিয়া খবর দেন, "কয়েকজন ভদ্রলোক দেখা করতে চান আপনাব সঙ্গে ; এ অঞ্চলের 'রইস' এঁরা।"

"আচ্ছা, আসতে বলুন।"

"হেঁ হেঁ হেঁ—এই আপনার সঙ্গে ফ্লড্ সম্বন্ধে কথা বলতে এলাম। আপনি এসেছেন শুনেই ছুটে এসেছি। একটা আলাদা ফ্লড রিলিফ-কমিটি কায়েম করা যায় না?"

"একটা আছে না?"

"ওটা কংগ্রেসীদের ঘরোয়া। সেবার কাজ তো কেবল খদ্দরধারীদের একচেটিয়া নয়।"

"আচ্ছা, এ বিষয়ে পরে কথাবার্তা হবে। এখন একটু অন্য কাজ আছে।"

"হেঁ হেঁ, আচ্ছা, তাহলে পরে আবার দেখা করব"—কয়েকপাটি পান-খাওয়া দাঁতের সমাহার।

"বোরস্"! কম্পমান দরজার পর্দায় এখনও তিনটি ছায়া দেখা যাইতেছে।

ক্রীং ক্রীং।

"হুজোর।"

"ওভারসিয়ার বাবুকো সেলাম দেও।"

"হুজোর।"

"ওভারসিয়ার বাবু, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের একটা নৌকা নেই ?"

"১৯৩৭ এর গত ফ্লড্‌এর পর আটখানা নৌকো এখানে রাখবার ব্যবস্থা হয়। এতদিন এখানে পড়েছিল। এ কয় বছর কোনো কাজে আসে নি। এইসব 'রইস'রা নিজেদের বাড়ির কাজে লাগাইতেন। ব্যবহারের অযোগ্য বলে এ বছর চেয়ারম্যান সাহেব নিলাম করে দিয়েছেন।"

"কিনেছে কে ?"

"এই খানিক আগে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরাই।"

"তাঁরা ব্যবহারের অযোগ্য নৌকো নিয়ে কি করবেন ? ব্যবহারের অযোগ্য রিপোর্ট দিয়েছিল কে ? আপনি ? ব্যবহারের অযোগ্য—ননসেন্স। ঐ নৌকোয় বেঙ্গলে নুন 'স্মাগল' করা হবে। সব খবর আমরা রাখি। কেরানী বাবু লিখুন। টু দি চেয়ারম্যান। বন্যাপীড়িত অঞ্চলের জন্য কখানি নৌকো দিতে পারেন ? টু-দি কলেক্টর···আজকের রিপোর্ট ভোরের ট্রেনে যেন চলে যায়, কেরানী বাবু।"

"নিরঞ্জন বাবুকে ডাকো—রিলিফ কমিটির সেক্রেটারীকে। চাই ফিগার্‌স। কত গ্রাম অ্যাফেক্‌টেড, লোক মরছে কি ? গরু বাছুর ? কোন্ কোন্ গ্রাম একেবারে ভেসে গিয়েছে ? কত নৌকো দরকার ? ভেটারনারী ডাক্তারকে নিশ্চয়ই সপ্তাহে একদিন এখানে সেণ্টার খুলতে হবে। আরও কত লেখাপড়ার কাজ আছে। ষ্টেনোকে নিয়ে এলাম না, বড় ভুল হয়ে গেল।"

দিনরাত লেখাপড়ার কাজ চলিতেছে; আর চলিতেছে সোডা আর রম্।

"মেডিকাল ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে লেখাপড়া। ভেসেলিন লাগবে বললেন না ডাক্তারবাবু পাঁকুইয়ের জন্যে? আর সালফিনামাইড্। কলেরা ইনকুলেশন, সে তো পরে হলেও চলবে। কুইনিন, মেপাক্রিন। ডি, ও দিন হেলথ্ অফিসারের কাছে। আর—একখানা দিন রিজিওনাল গ্রেন সাপ্লাই অফিসারের কাছে—দু' ওয়াগন ভুট্টার জন্য তাগাদা। কলেক্টরের কাছে চিঠি দিন—জল সরলেই বীজ লাগবে। হাজার মন কলাই, হাজার মন কুরথী।"

"ষ্টাটিস্‌টিক্স যোগাড় করুন, কত বাড়ি ভেঙে পড়ে গিয়েছে। তাদের জন্যে গড়ে দেড়শো টাকা করে বাড়ি তৈরির হারে গ্রাটুইটাস রিলিফ দেওয়া হবে। হিসেবের ফর্দ করে পাঠিয়ে দিন নেক্‌স্‌ট ডাকে। হ্যাঁ আর একটা লিষ্ট করতে হবে 'তাকাভি' লোনের। লোনে বীজ দেওয়াই ভালো; টাকা পেলে তারা অন্য কাজে খরচ করে ফেলবে।"

"টু দি কলেক্টর—এ অঞ্চলের গরু মহিষ যে সকল নির্বিঘ্ন স্থানে পাঠানো হইয়াছে সেখানকার জমিদারেরা, অথবা তাহাদের কর্মচারীরা গরু চরার জন্য মোটা টাকা আদায় করিতেছে। সমাজের 'পেষ্ট' এরা। তাদের কাছে চিঠি দিন, এই টাকা লওয়া বন্ধ করিতে। আরোগ্যের পথের রোগীর জন্য চাই মিছরি। সরকারী জেলা ফ্লুড কমিটির যে আটখানা নৌকো ছিল তাহার কি হইল?"

"এখানকার রিলিফ কমিটিতে কংগ্রেসী আর অকংগ্রেসী দলে বিশাল মতদ্বৈধ আছে। নির্দ্দেশ দিন কি করি।"

"একটা স্কীম এসেছে—পাট দেওয়া হবে বন্যাপীড়িত লোকদের। নেওয়া হবে তাদের কাছ থেকে পাটের দড়ি। মজুরি তারা পাবে।

মজুরির কিছু অংশ গভর্ণমেণ্টের ঘর থেকে দিতে হবে। এর নাম সুৎরী সেণ্টর স্কীম।"

লেফাফা, চিঠি, টেলিগ্রাম, সার্ভিস—মার্কা ডাকটিকিট, দিস্তা দিস্তা কাগজ, কলিং বেল্—"অত বড় কাগজে লিখবেন না। অর্ধেক করে নিন।" কেরানীবাবুর নিশ্বাস ফেলিবার ফুরসৎ নাই। লেখা পড়ার কাজ বাড়ে, কাজ এগোয় না। কাগজের চাপে আসল কাজের দম বন্ধ হইয়া আসে।

উত্তর আসা আরম্ভ হইয়াছে। ফাইল বাড়িতে থাকে।

"জেলায় অধিক বীজ না থাকায়, কৃষি বিভাগকে লেখা হইয়াছে। তাঁহারা দিতে পারিবেন কি না সে আশ্বাস এখনও পাওয়া যায় নাই। অসুবিধা হইতেছে যে, কণ্ট্রোল দাম বাজারদরের অর্ধেক।"

"রেললাইনে গরু চরা বারণ। উহার উপরের ঘাস কাটিয়া গরুকে খাওয়ান যাইতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, যাহারা ঐ ঘাস রেল-কোম্পানির নিকট হইতে বন্দোবস্ত লইয়াছে, তাহাদের কি হইবে। যাহা হউক, রেলওয়ে এস ডি ও-কে এ বিষয়ে লিখিতেছি।"

"সুৎরী সেণ্টর স্কীম অসম্ভব। যাহা হউক আমি লোকাল গভর্ণমেণ্টকে রেফার করিতেছি।"

"বার্লি লোকাল মার্কেট হইতে যোগাড় করিবার চেষ্টা করিবেন।"

"ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড লিখিতেছে যে, বন্যাপীড়িত লোকদের নৌকা সাপ্লাই করিবার নৈতিক অথবা কানুনী দায়িত্ব তাহাদের নাই। তাহাদের এই জবাবের জন্য শিক্ষা দেওয়া উচিত।"

"গ্রাটুইটাস রিলিফের জন্য পাঁচশো টিন কেরোসিন তেল চাহিয়াছেন। আজকাল কণ্ট্রোলের বাজারে ইহা অসম্ভব। পনেরো টিন লোকাল মার্কেট হইতে লইবেন। আমি পরে রিপ্লেস করিব।"

"ডিষ্ট্রিক্ট ফ্লড কমিটির সরকারী নৌকাগুলির কোন হদিস পাওয়া

যাইতেছে না। যে অফিসারের দায়িত্ব তাঁহার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করিয়া চিঠি দিয়াছি।"

চারিদিকে প্লাবনের জলের ফেনা; এখানে কেবল কথা আর কথা—কথার ফেনা! লাল ফিতার নাগপাশ আষ্টেপৃষ্ঠে বর্ত্তমান সমস্যাটিকে চাপিয়া ধরিয়াছে—অজগরের নিষ্পেষণে হরিণ-শিশুর মতো।

এদিকে সুমৃৎ নৌখেকে জিজ্ঞাসা করে, "ও কি করছে মহাত্মাজীর চেলারা?"

"আঁসশেওড়ার জঙ্গলে গন্ধওয়ালা দাওয়াই দিচ্ছে। সাপের ওষুধ।"

"এদিকে এত জাঁতা কেন?"

জবাব দেয় ভলান্টিয়র, "ব'সে ব'সে ভুট্টা পেষো। অর্দ্ধেক তোমাদের। অর্দ্ধেক আমাদের ফেরত দেবে। ব'সে খাবে কেন? ভিক্ষে নেবে কেন? নিজের রোজগার নিজে খাও।"

নৌখে আর সুমৃৎ দুজনে বলাবলি করে, "কথাটি ব'লেছে মার্কার কথা, দামী কথা।"

সারঙ্গীলাল 'রইস' হাকিম সাহেবকে লইয়া বজরায় উঠিতেছে; সাহেবকে বন্যাপীড়িত এলাকা দেখাইতে হইবে। সঙ্গে লইয়াছে কলের গান, থার্ম্মোফ্লাস্ক, টিফিন-ক্যারিয়র, সোডার বোতল, আরও কত কি।

সুমৃৎ আর নৌখে বোতলের দিকে ইসারা করিয়া চোখ টেপাটেপি করে।

রাত্রে হঠাৎ নৌখে ঝা'র পুত্রবধূর প্রসব বেদনা উঠিয়াছে। সুমৃতের স্ত্রী উৎকণ্ঠা চাপিয়া বলে, "এ আমি আগেই ভেবেছি। এ শরীরের অবস্থায় কি এত টানাপোড়েন সয়।" সুমৃৎ দৌড়িয়া রিলিফ কমিটিতে

খবর দিতে যায়। শীর্ষাবাদিয়া মনিরুদ্দি আর তাহার ভাই দলিমুদ্দি ক্যাম্পের এর কোণায় নিজেদের চাটাইগুলি দিয়া ঘিরিয়া আবরু করিয়া দেয়। কানী মুসহরনী মালসাতে করিয়া কাঠের আগুন লইয়া আসে। সুমৃতের স্ত্রীর সহিত অনেকেই সেই চাটাই ঘেরা স্থানে সারারাত চেঁচামেচি করে। ঘেরা পর্দার মধ্য হইতে শোনা যায় ঝা গিন্নী বলিতেছেন, "এতটা বয়স হল; কিন্তু এখনও আমি এসবে একেবারে হকচকিয়ে যাই। ভাগ্যি তুমি ছিলে বহিন। না হলে বিদেশে বিভুঁয়ে কি দশা যে হত এখন, তাই ভাবি।"

বাড়ী ছাড়িয়া কাহারও মন টিকে না। মৈনা বলদ জোড়ার সোজা শিং দুটিতে কতদিন তেল দেওয়া হয় নাই। লালিয়া গরুটি আবার জোলো ঘাস খায় না। হরখু চরবাহা গরুগুলিকে ভোখলাহার মাঠে কি অবস্থায় রাখিয়াছে, কে জানে। গোলার মকাইগুলি পচিয়া উঠিল। পশ্চিমের ঘরের দেওয়াল বোধহয় এতদিনে পড়িয়া গিয়াছে। পাৎরঙ্গীর লাউগাছটি বোধ হয় এতজলে মরিয়া গেল। আলিজানের বড় বলদটার আবার ঘাড়ের ঘা শুকাইতে ছিল না। গাঁয়ে বলদের ঘায়ের জন্য একটুও ফিনাইল পাওয়া যায় না। আর এখানে নালীর মধ্য দিয়া ফিনাইলের নদী বহিতেছে। কবে যে আবার ওপারের সবুজ মখমলে ঢাকা পাহাড়ের নীচেটা আবার দিনকয়েক আগের মত সাদা হইয়া যাইবে, কোশের পর কোশ সাদা কাশের চুনকামে। দিনরাত গল্পগুজব। কাপড়, চিনি, কেরোসিন তেলের অভাবের সেই একই কথা একঘেয়ে লাগিতেছে। রিলিফের বাবুদের আজব চালচলনের কথা, আর কতদিন বলা যায়। একটু প্রাণভয়ে নদীর জল খেতে দেবে না, এরা। কি যেন একটা বদ গন্ধওয়ালা ওষুধ মিলাইয়া দিবে। এখানে খয়নির থুতু ফেলতে দেবেনা। থুতু আবার গিয়ে ফেলে আসতে হবে কোথায়?

নিরবচ্ছিন্ন অবসরের একঘেয়েমির মধ্যে এই সব বাধানিষেধগুলি আরও বিরক্তিকর হইয়া উঠে। নৌখে, স্নমৃৎ আর মনিরুদ্দি প্রত্যহ বহু রাত পর্য্যন্ত জাগিয়া গল্প করে। ভিন গাঁয়ের নানারকম লোক— বলা তো যায় না। গাঁয়ের মেয়েদের মধ্যে কেউ যদি রাতে ভয়ডর পাইয়া চীৎকার করিয়া ওঠে।

ঘুম ভাঙিলেই প্রত্যেকেরই মনে পড়ে—জল কমিতে আরম্ভ করিয়াছে কি? ভোর হইতেই প্রত্যহ সকলে ছুটিয়া দেখিয়া যায় জলের অবস্থা। ষ্টীমারঘাটের পাশের ময়রার দোকানের নীচে ছিল একটি টিউবওয়েল। এখন আর তাহা ব্যবহার করা হয় না; কিন্তু এখন সেটি হইয়াছে কত জল বাড়িয়াছে তাহা মাপিবার যন্ত্র।

"আজ যেন কলের উপরের খাঁজটি দেখা যাচ্ছে।" "দূর, ওতো হাওয়ায় জলে ঢেউ লেগেছে, তাই।'

সেদিন প্রত্যুষে নৌখে ঝা নদীতে মুখ হাত ধুইতে গিয়াছে। হঠাৎ সে উত্তেজিতভাবে দৌড়াইয়া ফিরিয়া আসে। হঠাৎ চীৎকার করিতে করিতে আসে, "জল কমছে, জল কমছে স্নমৃৎ—"

"সত্যি?" যেন বিশ্বাস হইতে চায় না।

"তা না তো কি মিথ্যে বলছি? দু' আঙ্গুল চার আঙ্গুল নয়—আধ হাত কমেছে।"

"চুপ চাপ থাক্, আর বলিস না। আবার হয়ত বেড়ে যাবে।" সকলে ধড়্মড়্ করিয়া উঠে, ছেলেরা কাঁদে। মায়েরা ছেলে ফেলিয়া জল দেখিতে যায়। লোকে লোকারণ্য, টিউবওয়েলের ত্রিশ গজের মধ্যে যে পৌছিতে পারে সেই ভাগ্যবান।

"পূবে হাওয়া দিচ্ছে। আর জল বাড়বে না।"

"কিচ্ছু বিশ্বাস নেই।"

"আবার আশ্বিনে আর-এক ঝোঁক আছে।"

"আর এখনই একটু গরম পড়লে, আজই আবার জল বেড়ে যাবে।"

হট্টগোলে হাকিম সাহেবের ঘুম ভাঙে, চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে ডোরাকাটা স্লিপিং সুট পরিয়া এদিকে আসেন। কেরানীবাবু, ওভারসিয়র বাবু আগাইয়া আসে। "জল তাহলে সত্যিই কমল। কালকের ষ্টেট্সম্যানে দেখছিলাম যে এলাহাবাদে গঙ্গার ম্যাক্সিমাম জল বাড়বার রেকর্ড পৌঁছুতে আর মাত্র এক ফুট বাকি।" ওভারসিয়র বাবু এই অভাবনীয় সংবাদের আরও বিস্তৃত খবর জানিতে কৌতুহল প্রকাশ করেন।

"হটো, হটো, রাস্তা ছাড়ো।" হাকিম ডাকবাংলাতে ফিরিয়া যান।

হু হু করিয়া জল কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। যেরূপ গতিতে বান আসিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা তীব্রতর গতিতে জল শুকাইতেছে।

দলে দলে লোক প্রতি ঘণ্টায় জলের মাপ দেখিতে আসে।

এ কয়দিন বন্যার স্রোতে, গ্রামের কলহ, মনের পঙ্কিলতা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। প্লাবনের বিশালতার মধ্যে গ্রামীন মনের সংকীর্ণতার স্থান ছিল না। পরের দিন গোবরাহা দিয়ারার কালো মাটি জলের মধ্য হইতে মাথা চাড়া দিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে এই কয়দিনের অবচেতন স্বার্থলোলুপ কিষাণ মন, আবার চেতন হইয়া উঠে। অস্বাভাবিক পরিবেশের সমাপ্তির সহিত স্বাভাবিক গ্রামীন মনও মাথা চাড়া দিয়ে উঠে।

কালো, ভিজা, আঠালো পলিমাটি। কলাই কুর্থী ফেলিয়া দাও, কোঁচড়ের মধ্য হইতে কেবল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও। জমি তৈয়ারী করিবার দরকার নাই, কেবল ফেলিবার মেহনৎ। নরম পাঁকের

মধ্যে পা বসিয়া যায়, সেই পা কাদা ঠেলিয়া তোলার মেহনৎ। নিড়ানোর দরকার নাই, মজুরের খরচ নাই ; সোনার ফসল ফলিবে।

যাহা পাও নিজস্ব করিয়া লও। সব জিনিস ব্যক্তিগত করিয়া লইতে চেষ্টা কর ; নিঙড়াইয়া লও, শুষিয়া লও। চুরি করিয়া লও, লাঠির জোরে লও।

জমি, পলিমাটি-পড়া কালো জমি দেখিয়া, আদিম লোভাতুর কিষাণ মন চঞ্চল না হইয়া থাকিতে পারে ? বন্যার জল সরিতেছে—রাখিয়া যাইতেছে কুটিল সংকীর্ণ মনের ঈর্ষাদ্বন্দ্বের উর্বর ভূমি ; কলাইয়ের ও কলহের ফসলের উপযুক্ত ক্ষেত্র।

নাম লেখাও, কণ্ট্রোল দরে কলাই কুর্থীর বীজের জন্য। সুমৃৎ নিজের জমি লেখায় তিন হাজার বিঘা, নৌখে লেখায় চার হাজার বিঘা।

সুমৃৎ অন্য তিয়রদের নাম লেখায়। হাকিম বলেন, "গেনা তিয়র, কত বিঘা জমি, কত টাকা তাকাভি চাই ? এক সঙ্গে সকলে কথা বলবেন না ; আপনি কেন ওর হয়ে বলছেন ? যার জমি, সেই বলবে।"

সুমৃৎ বলে, "ও জাতে তিয়র, নিরক্ষর অন্ধ, তাই আমি বলে দিচ্ছিলাম।"

"অন্ধ ?"

"লেখাপড়া জানে না, তাই বলছিলাম, দৃষ্টি নেই।"

নৌখে ঝা ব্রাহ্মণদলের নেতৃত্ব করে। বলে, "ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণের গতি ; একে হুজুর বিনা পয়সায় বীজ দিতে হবে, এর জমি নেই এক ধুরও।"

সুমৃৎ বলিয়া উঠে, "না হুজুর, এর পনেরো—ষোলো বিঘা জমি আছে।"

বচসা জমিয়া উঠে। হাকিম অতিষ্ঠ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওভারসিয়র বাবু, আপনিই তাহলে লিষ্টটা করুন। আমি একটু আসছি।" যে যাহা পারে সঞ্চয় করিতেছে। সাঁওতালদের জন্য বীজের কথা, না নৌখে ঝা, না সুমৃতের মনে আসে। বিরসা মাঝি গরুর জন্য ফিনাইল চুরি করিয়া মাটির গেলাসে রাখে। মঙ্গল মুসহর রিলিফের বাবুদের কাছে চুপি চুপি ইহার খবর দিয়া আসে। পাৎরজীর ছাগলটা শুকনো শালপাতা চিবাইতেছিল। গোকুল তিয়র এদিক ওদিক তাকাইয়া তাহার পেটে সজোরে এক লাথি মারে। তুরিয়া বাঁতারের পুত্রবধূ কাপড়ের আঁচলে, আধসেরটাক নুন বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। তাহা ভিজিয়া উঠিয়াছে। কানী মুসহরনী ভয় দেখায়, আমি হাকিমকে বলিয়া দিব। সাঁওতালেরা শুকনো শালপাতার বোঝা বাঁধে, বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য।

সুমৃতের স্ত্রীর কাপড়খানি শুকাইতে দেওয়া হইয়াছিল, হঠাৎ সেখানিকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 'যত চোরের আড্ডা' বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণ মহিলাদের ভিতর দিয়া চলিয়া যান।

কাহারা কত তাড়াতাড়ি এখান হইতে বাহির হইতে পারে, তাহারই জন্য বাঁধাছাঁদা চলিতেছে। কয়দিনের মেলা ভাঙিয়া গেল। গনুয়া মুসহর বলে, "বাধিয়ারা যাবে না?"

"মুখ সামলে কথা বলিস। 'শীর্ধাবাদিয়া' না বলে ফের যদি 'বাধিয়া' বলিস, তা হলে জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলব—বলে রাখলাম।"

মুসহর আর সাঁওতালেরা বাহির হইয়া পড়ে, এ কয়দিনের হাসিখুশি আলাপ নাই। সকলের মনের মধ্যে আগামী সমৃদ্ধির ছবি; বাড়ী গিয়া কি দেখিব, এই উৎকণ্ঠার মধ্যেও অতীতের ক্ষতি অনায়াসে ভুলিবার প্রয়াস।

তুচ্ছ জিনিস লইয়া ছোটোখাটো ঝগড়া লাগিয়াই আছে। হাতগজ,

চেন, লগা, বিঘা কাঠার দ্বারা সীমায়িত, সংকীর্ণ জমির মালিক। উদারতা আসিবে কোথা হইতে? শীর্ষাবাদিয়া, মুসহর ও সাঁওতালদের নৌকার দরকার নাই। মধ্যের কোশখানেও একবুক জল তাহারা হাঁটিয়া চলিয়া যাইবে। কিছু কষ্টই নাই। কতটুকুই বা বোঝা—কত কটা বীজই বা পাইয়াছে। মুসহর ছেলেপিলেরা এখনই বীজের কলাই চিবাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

মনিরুদ্দি বলে, "ছোটলোক কোথাকার, গায়ে কাদা ছিটোচ্ছ?"

"আমি কি ইচ্ছা ক'রে দিচ্ছি নাকি'—বিরসা সাঁওতাল জবাব দেয়।

গেনুয়া মুসহর ফিস ফিস করিয়া নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, "সেদিন ইস্কুলের কাছে বানে একটা হরিণ ভেসে এসেছিল। সেটাকে আমি আর হরিয়া প্রথমে ছুঁয়েছিলাম। ঐ শালা বাধিয়া মনিরুদ্দি কোথা থেকে এসে খচ করে ছুরি দিয়ে হরিণটিকে জবাই করে। আর সঙ্গে সঙ্গে হরিণটার গায়ে থুতু দিয়ে দেয়—যাতে আর কেহ ঐ মাংস না খায়। একেবারে পাষণ্ড। কি দিয়েই যে ভগবান এদের সৃষ্টি করেছিলেন! হরিণটার পেটে আবার বাচ্চা ছিল। 'বাধিয়া' বলবে না, ওঁকে গুরুঠাকুর বলবে।"

তিয়রদের মধ্যে একা সুমৃৎ নৌকা আনাইয়াছে, অনুরূপ ঝা তাহাতে জিনিসপত্র রাখিতে চায়। সুমৃৎ বলে, "সরিয়ে নাও, নামিয়ে নাও বস্তা, জায়গা নেই।" অনুরূপ ঝা কাকুতি মিনতি করে।—নৌখের পুত্রবধূ আর একটু ভালো না হইলে, নৌখে ঝা যাইতে পারে না; ব্রাহ্মণদের মধ্যে, আর কাহারও নৌকা ভাড়া করিবার সংগতি নাই, আর তাহা হইলেই তাহার কলাই বুনিবার দেরি হইয়া যাইবে। শীত পড়িলে আর কলাই বুনিয়া কি হইবে? পাঁক শুকাইলে, কলাই বোনা-না-বোনা সমান।

"ও সব আবদার তোমার গুরু নৌথে ঝার কাছে গিয়ে করোগে যাও। শীগগির নামো বলছি।"

"আচ্ছা, ভগবান আছেন।"

"শাপ দেওয়া হচ্ছে! রহিকপুরার বামুনের দেওয়া শাপ স্থমৃৎ তিয়র এই—" ফুঃ ফুঃ বলিয়া হাতের তেলোয় ফুঁ দিয়া, নদীর দিকে উড়াইয়া দেয়।

স্থমৃৎ মেয়েকে বলে, "মাকে ডাক্। এখনও সেখানে কি হচ্ছে?"

স্থমৃতের স্ত্রী নিজের কাপড়খানি তখনও খুঁজিতেছিলেন—"থাক্, ও আর পাওয়া যাবে না। কোন্ মুসহরনী নিয়ে গিয়েছে কে জানে। একবার আঁতুড়ঘরে কচি বৌটিকে দেখে আসা যাক—যতই ঝগড়া থাক বৌটি একদিন তো মা বলেছিল। বড় ভাল মেয়েটি, হাজার হ'লেও রহিকপুরার বামুনের ঝাড় তো নয়। এখনও সঙ্গদোষে খারাপ হতে পারেনি!"

হঠাৎ আঁতুড়ঘরে ঢুকিতেই দেখেন, নৌথে ঝার স্ত্রী তাড়াতাড়ি একখানি তাঁহারই শাড়ির মত আধময়লা শাড়ি প্রস্থতির বালিশের নীচে লুকাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন। তিয়র-গিন্নির মাথায় রক্ত চড়িয়া যায়। বৌটির সহিত দেখা করিবার কথা আর মনে থাকে না। বন্যার স্রোতের মত গালির স্রোত বহিতে থাকে। একজন সাঁওতালনী, ঠেলিয়া দুইজনকে আলাদা করিয়া দিতে দিতে, নির্বিকারভাবে সঙ্গিনীকে বলে, "বিদেশে বিভূঁয়ে আজকালকার দিনে আঁতুড়ের কাপড় জোটান যে কী ব্যাপার, তা কেউ ভাববে না।"

ভলান্টিয়াররা কর্ডন করিয়া বামুনের দলকে ঘিরিয়া রাখে। তিয়রেরা নৌকা হইতে চীৎকার করে "চোট্টা ভণ্ডের দল।" কর্ডনের ভিতর হইতে বামুনেরা বলে, "ছোট জাতের পয়সার গরম শীগগিরই বেরবে।"

নৌকা ছাড়িয়া দেয়। পাৎরঙ্গী আবার কখন তাহার ছাগলটিকে চড়াইয়া দিয়াছে নৌকার উপর। সুমৃৎ তিয়র ছুঁড়িয়া ছাগলটিকে নদীর তীরের দিকে ফেলে, আর সেটিকে উদ্দেশ করিয়া বলে, "তোর জাতভাইদের এখানে ছেড়ে গেলাম। তাদের সঙ্গে আসিস।"

পাৎরঙ্গী চীৎকার করিয়া এককোমর জলে নামিয়া পড়ে, ছাগলটিকে বাঁচাইবার জন্য।

আণ্টা-বাংলো

তরাইয়ের বন্য প্রকৃতিকে ও নিরীহ প্রকৃতির মানুষদের আয়ত্তে আনিয়া যে সময় নীলকর সাহেবেরা একচ্ছত্র আধিপত্য করিত, সেই সময়ের কথা। মানুষদের কথাই বলি; সমুদ্রের নীল রং দেখিবার সুযোগ তাহাদের হয় নাই, আকাশের নীলের দিকে তাহারা কোনদিন তাকাইয়া দেখে নাই; কুঠির বড় বড় চৌবাচ্চায় তাহারা দেখিয়াছে গোলা নীলের সমুদ্র, বহু পরিচিত আত্মীয় স্বজনের দেহে দেখিয়াছে নীল কালশিরার দাগ।

নীলায় বিচ্ছুরিত আলোকে প্রতিফলিত বুদ্বুদের কেন্দ্র ছিল 'প্ল্যাণ্টারস্ ক্লাব'—জেলার লোকে বলিত 'আণ্টা-বাংলা'। তখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ভার্নেডী সাহেব শীতে ও গ্রীষ্মে ঘোড়ায় চড়িয়া মফঃস্বলে টুরে বাহির হইতেন, আর সারা বর্ষাকালটা আন্টাবাংলায় বসিয়া মদ খাইতেন।

একটি বিরাট কম্পাউণ্ডের মধ্যে বিলাতী কটেজের ধরণের একটি বাড়ি। ধবধবে চুনকাম করা দেওয়ালের উপর সোনালী খড় দিয়া ছাওয়া—জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে শ্বেতহস্তীর মত। ডিউর‍্যাণ্ডার বেড়ার উপর দিয়া বহুদূর হইতে লোকে দেখিত ভীতি, কৌতুহল ও সম্ভ্রমের সহিত। তর্জনীসঙ্কেতে সঙ্গীকে দেখাইয়া দিত—"ঐ দ্যাখ

আন্টাবাংলা''। সাহেবদের কুকুরগুলি পর্যন্ত ছিল বিলাতী। ক্লাবের মেথর 'দুসাধ' চাকরগুলো আর কেরানীবাবু ছাড়া, কোনো নেটিভ দেখে নাই বারান্দায় পাতা সারি সারি চেয়ারগুলি, ছাতার মত গুগ্‌গুল গাছটার তলায় পাতা চেয়ার, টেবিল, টিপয়। কোনো ইণ্ডিয়ানের কানে পৌঁছায় নাই, ঘরের ভিতরের বিলিয়ার্ড বলের শব্দ, কাচের গ্লাসের নিক্কণ; সাহেবদের কোচম্যান সহিসগুলোর পর্যন্ত নয়। তাদের গাড়ি দাঁড় করাইতে হইত ফটকের বাহিরে, অশথ গাছের তলায়। চীনের প্রাচীরের মত রহস্যভরা ডিউর‍্যাণ্ডার বেড়া—এমন সমান করিয়া ছাঁটা যে, মনে হয় বুঝি-বা উহার উপর শোয়া যায়—ভিজা মেঝে, এমন কি পেট নীচু খাটিয়ার চাইতেও আরামে শোয়া যায়।

নীলকর সাহেবরা 'প্ল্যান্টারস ক্লাব' বলিত না! 'খ্লাব,' না হয় 'ইরপিয়ন খ্লাব'।

সব সাহেব কলেক্টরই ইহার মেম্বার হইতেন। কেবল এক হর্ন সাহেব ইহার মেম্বার হইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন যে, তিনি সত্যিকারের ইউরোপীয়ান ক্লাবের সদস্য হইতে পারেন, এ ক্লাবের নয়। নীলকরেরা এই অপমান মাথা পাতিয়া লয় নাই। দিন কয়েকের মধ্যে হর্নসাহেব বদলি হইয়া যান। এই প্ল্যাণ্টাররাই তখন আসল দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কেবল নিজের কুঠির কাছের এলাকায় নয়, সরকারী দপ্তরও তখন ইহাদের কথায় উঠে, বসে। এ জেলা ছিল সাহেব অফিসারদের স্বর্গরাজ্য। ম্যালেরিয়ার ভয়ে তাহারা প্রথমে আসিতে চাহিত না। এখানে বদলি হইলেই বলিত 'কালাপানির' সাজা হইয়াছে। ট্রান্সফার নাকচ করিবার জন্য সেক্রেটারিয়েটে দৌড়াদৌড়ি করিত। পরে একবার আসিয়া পড়িলে আর ফিরিয়া যাইবার নাম করিত না।

এমন আঙ্‌লো-ইণ্ডিয়ান সমাজের সঙ্গসুখ, নেপাল তরাইয়ের এমন শিকারের প্রাচুর্য, আর কোথায় পাওয়া যাইবে। 'কালাপানির' একটি আগুল্‌ফ গাউন পরিহিতা স্বর্ণকমলের সঙ্গে টমটমে চড়িয়া কুলের ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাওয়া, স্বপ্নরাজ্যের মতই মধুর। এই ভুজ-মৃণালের বন্ধন, কখন যে বৈধতার শৃঙ্খলে পরিণত হইত, তাহা অনেকে বুঝিতেও পারিতেন না।

সেই যুগের রবিবার।

সকাল হইতেই মফঃস্বলের বহু দূর দূর হইতে সাহেব মেমের দল শহরে আসিতেছে।

কালো টমটমে মিস্টার আর মিসিজ মোবার্লি। গাড়ির চাকা-গুলি লাল। দেওনন্দন মোক্তার হাকিমদের বাড়িতে সাপ্তাহিক তীর্থ পরিক্রমা করিতে বাহির হইয়াছেন—সাদা টমটম। সাহেবের টমটম পাস করাইবার জন্য, নিজে পাশ কাটাইয়া রাস্তার কাঁচা অংশটির উপর গাড়ি থামাইলেন। মুখে হাসি আনিবার চেষ্টা করিয়া মোক্তার সাহেব সাহেবকে সেলাম করিলেন। মোবার্লি বোধ হয় দেখিতে পাইলেন না। নেটিভদের গাড়ি পাশ করিলেই তখন মেম সাহেবেরা গাউনের ধূলা ঝাড়িতে অভ্যস্ত। সেই প্রত্যাশিত ধূলা ঝাড়িবার সময় মিসিজ মোবার্লি মোক্তার সাহেবের গাড়ির দিকে এমন ভ্রূকুটী হানিলেন যে, তিনি সঙ্কুচিত হইয়া যেন নিজের ঐ সময়ের গাড়ি চালানোর ধৃষ্টতায় নিজের উপর বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিলেন।

কালো রঙের ঘোড়ায় বেলী সাহেব। এমন জোরে ঘোড়া ছুটাইয়া আসিয়াছেন যে, এই ভোর বেলাতেও ঘোড়ার মুখ দিয়া গ্যাঁজলা বাহির হইতেছে। ঘোড়াটি প্রোটেষ্টান্ট গির্জার য়্যালোর (aloe) বেড়া লাফাইয়া পার হইয়া গির্জার হাতায় ঢোকে। ঘোড়ার জন্য পাগল সাহেবটা। অষ্ট্রেলিয়া হইতে ঘাস আনায়।

শ্যাম্পনিতে ঠুকুর ঠুকুর করিয়া আসিতেছেন টমসন সাহেবের মেয়ে ফেলিসিয়া টমসন—কালাবালুয়া কুঠি থেকে। তেরো মাইল দূরে কালাবালুয়া কুঠি। বুড়ো বাপ সংগে আসেনি; না, বাপকে ইচ্ছা করিয়াই ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছে কে জানে। আয়নার মত চকচকে বার্নিশ করা শ্যাম্পনিতে মুখ দেখা যায়। বলদজোড়ার গলায় ঘণ্টা বাজিতেছে, 'বিগবেনে'র ধ্বনিতে। শ্যাম্পনিটি ঢুকিল বেঞ্জামিন সাহেবের বাংলায়। গির্জার কাজ সারিয়া আসিয়া এইখানেই সারাদিন থাকিবে। বিকালে ছোট বেঞ্জামিনের সহিত ক্লাবে যাইবে। স্যাবাথের দিনেও নাচিবে; যে যাহা ইচ্ছা হয় বলুক। ডাইনী বুড়ীর মত দেখিতে, মিসিজ জনস্টনের খোঁটার তোয়াক্কা রাখিলে দুনিয়ায় বাঁচা শক্ত…

রবিবার তিনটি গির্জাই লোকে লোকারণ্য; না, সাহেবদের 'লোক' বলিয়া হয়ত বা তাহাদের ছোট করা হইল। আজ সারাদিন রামবাগের সাহেবদের বাংলোগুলি অতিথিদের কল-কাকলীতে সরগরম থাকিবে, আর বিকালে আণ্টা-বাংলার বাহিরের অশথ গাছের নীচে বসিবে রঙ-বেরঙের গাড়ি-ঘোড়া বলদের মেলা।

ছোট বেঞ্জামিন ক্লাবের সেক্রেটারী। 'প্ল্যাণ্টারস ক্লাবে'র সেক্রেটারী সোজা পদ নয়। যে সে হইতে পারে না। অন্তত চিঠিপত্র লিখিতে জানা চাই; "ডারজিলিং" (Darjeeling) অথবা "ডাইনাপো, খুর্জি" (Dinapore, Kurji) স্কুল একবার ঘুরিয়া আসা চাই; পুরানো নীলকর সাহেবের বংশের ছেলে হওয়া চাই; ক্লাবের দুই চার মাইলের মধ্যে বাড়ি হওয়া চাই। সাধে কি আর হাকিমরা ভয় করে, মেয়েরা তাহাকে লইয়া কাড়াকাড়ি করে, বুড়ী মেমেরা তাহাদের নিজের হাতের তৈয়ারী কেক খাওয়ায়, লাট সাহেব শিকারে আসিলে তাঁহার সহিত খানা খাইবার নিমন্ত্রণ হয়।

এই রবিবারের দিনটির অপেক্ষা করিয়াই বেঞ্জামিন শুক্রবার হইতে ক্লাবের 'বার রুম'টি নূতন করিয়া তৈয়ারী করাইবার কাজে হাত দিয়াছে। এতদিন অফিস ঘরেই 'বার রুমে'র কাজ চলিতেছিল। দুপুরে বাড়ির ভিড়ে আর বুড়ো বাবা মার কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় ফেলিসিয়া টমসনকে লইয়া একটু সুস্থির হইয়া দুই দণ্ড গল্প করিবার জো নাই। তাই একটু নিরালায় ক্লাবে আসা—ঘরটির নির্মাণ কার্য তদারক করিবার অছিলায়। তিনদিন হইতে কাজ চলিতেছে। ইটের দেওয়াল, কাদার গাঁথুনি। গুল্‌টেন রাজমিস্ত্রী গাঁথে, বিরসা ওরাওঁ মিস্ত্রীকে ইট কাদার যোগান দেয়, বিরসার পুত্রবধূ মাটির ঢেলা বাঁশ দিয়া পিটাইয়া কুশের শিকড় আলাদা করে, কোদাল দিয়া গুঁড়া মাটির মন্দির তৈয়ারী করে; মন্দিরের চূড়ায় গর্ত করিয়া জল দিয়া কাদা গোলে। ছোট বেঞ্জামিন গরমের মধ্যে সারাদিন কেবল গেঞ্জির আণ্ডারওয়ার পরিয়া ইহাদের কাজের তদারক করে। নেটিভদের সম্মুখে আবার লজ্জা কি? গরমের দিনে ইহাও ভারি সুবিধা। দুপুরবেলায় ক্লাবে কোন শিষ্টাচারের প্রয়োজন নাই। বারে বারে স্যাণ্ডউইচ খাও, বিয়ার টানো, মার্কারের সহিত বিলিয়ার্ড খেলো, বাথরুমের জানালা হইতে বিরসাকে তাড়া দাও।

বিরসা ওরাওঁ বেঞ্জামিনদের তিন পুরুষের 'আধিয়াদার'। তিন পুরুষ হইতে তাহারা বেঞ্জামিন পরিবারের "তসিলদারের" নিকট হইতে দাদন হিসাবে ধান লয়, চার বিঘা 'বটাই' জমির তিন বিঘায় নীলের চাষ করে। ছোটো বেঞ্জামিনের ঠাকুর্দা কালো ঘোড়ায় চড়িয়া ক্ষেত দেখিতে আসিলে বিরসার ঠাকুর্দা সেলাম করিত। "কিছুই মেহনৎ করো না। তোমার মেয়েকেও তো ক্ষেতে কাজ করতে দেখছি না" বলিয়া চোখের ইসারা করিয়া চাবুক ঘুরাইলে সে "হুজুর মা-বাপ" বলিয়া আরও ঝুঁকিয়া সেলাম করিত। "আমি বাপও

না, যাও না” বলিয়া ঘোড়া ছুটাইতে আরম্ভ করিলে, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বটুয়া খুলিয়া খইনি ডলিতে বসিত।

এইরূপই পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছিল। রবিবার গির্জা হইতে ক্লাবে আসিয়া ছোট বেঞ্জামিন দেখে যে গুল্টেন রাজমিস্ত্রী গেটের নিকট ‘কর্ণিক’ হাতে লইয়া বসিয়া রহিয়াছে।

গুল্টেন তাড়াতাড়ি উঠিয়া সেলাম করে।

“এখনও বসে যে? গরমের দিনে সকালের দিকে কাজ বেশী হয়। তোমাদের অদ্ভুত অভ্যাস।”

“না হুজুর মা-বাপ। মজুর এখনও আসেনি তাই···”

“বিরসা আসেনি? এখনও আসেনি! সে রাস্কেল বোধ হয় ক্ষেতে কাজ করতে গিয়েছে।” বিরক্ত হইয়া সে পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখে। “ভ্লাডী?”

তাহার পর ভাবে যে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া দেখা যাক। কিছুক্ষণ সুরকি বিছানো রাস্তায় মস্ মস্ করিয়া পায়চারি করে, শিস দেয়, ফেলিসিয়া টমসনের কথা ভাবে···গির্জায় টমসন পরিবারের ‘পিউ’টিতে খানিক আগের দেখা ছোট্ট ছোট্ট পা দুখানি; ইচ্ছা করে পা দুখানিকে মুঠার মধ্যে লইয়া পিষিয়া ফেলিতে; আশ্চর্য! গির্জার বেদী অপেক্ষাও স্বর্গীয়!···তাহার পর উপমার অশোভনতার কথা মনে পড়ে। দুই হাত ‘ক্রস’ করিয়া পরমপিতার নিকট মনে মনে ক্ষমা চায়।···ফেলিসিয়া বোধ হয় এতক্ষণ মা’র নিকট তাহার নতুন বাবুর্চির নিন্দা করিতেছে। শীতকালে লাটসাহেব যখন তাহার টেনিস খেলার প্রশংসা করিতেছিলেন,—“ঠিক ডোহার্টির মত ষ্টাইল কোথা হইতে পাইলেন”—সেই সময় ফেলিসিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া···।

অনেকক্ষণ হইয়া গেল। সূর্যের তেজ বাড়িতেছে। বেঞ্জামিনের গা দিয়া ঘাম ঝরিতেছে। আবহাওয়া ও বিরক্তিকর স্থিতি দুই

'মুইসেন্সে'র কথা মনে করিয়াই আবার বলিয়া উঠে, "ভ্লাডী"। আর তাহার বিরসার জন্য প্রতীক্ষা করিবার ধৈর্য নাই। রাগের জ্বালায় জোরে জোরে পা ফেলিয়া সে ফটকের বাহির হইয়া পড়ে, বিরসার বাড়ির দিকে; কাছে পাইলে এখনই তাহাকে ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে। মরগামায় বিরসার বাড়ির দিকে মেঠো পথে কিছুদূর যাইতেই ধুরী গয়লার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া যায়। ধুরী ঝুঁকিয়া সেলাম করে। ভালই হইল—আর এই কাঠফাটা রৌদ্রের মধ্যে বেশীদূর যাইতে হইল না। ঝোঁকের মাথায় এতদূর আসিয়া পড়িয়াছে।

"ধুরী, বিরসাকে দেখেছিস ?"

"হুজুর সে ক্ষেতের দিকে গিয়েছে হালবলদ নিয়ে—"

"বদমাসটাকে সায়েস্তা করতে হবে। তাকে আণ্টা-বাংলায় আসতে বলবি, জলদি, এখনই। বলবি আমি ডেকেছি।"

পূর্ব্বাপেক্ষা বড় বড় পা ফেলিয়া বেঞ্জামিন ক্লাবে ফিরিয়া আসে। আবার গুগ্‌গুল্ গাছটির নীচে অধৈর্য হইয়া তাহার প্রজা বিরসার ধৃষ্টতার কথা ভাবে; এত সাহস! একথা তাহারা কোনদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই। নীলের "বটাইদার" (বর্গাদার) 'মালিকের' জন্য কাজ করিতে গাফিলতি দেখাইয়াছে, এমন কথা তাহারা কোনও দিন শোনে নাই। প্রত্যহই তো আর তাহাকে 'মালিকের' জন্য কাজ করিতে বলা হইতেছে না। আজ অন্য বটাইদারকে জমি দিয়া দিলে কাল ইঁদুরের মত না খাইয়া মরিবে, দু'দশদিন মালিকের জন্য কাজ করিয়া দিতেই যত আপত্তি। এ অবাধ্যতা আমাকে অপমান করিবার জন্য। বিশেষ করিয়া ক্লাবের কাজে, পাবলিকের কাজে, এই দায়িত্বজ্ঞানহীনতা অসহ্য! 'কালে কালে হইল কি!' বিরসার পুত্র-বধূ যে কাদা-মাটির যোগান দিতেছিল, সেই বা আসিল না কেন?

নিশ্চয়ই সকলে মিলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া আসে নাই। ইহার বিহিত করিতেই হয়। ইহাদের মধ্যে একজন আসিলেও কাজ চালানো যাইত।

ফোর্ট উইলিয়মের ভিতরের দোকান হইতে কেনা বুটের আঘাতে তরাইয়ের নরম মাটি খাবলা খাবলা উঠিয়া আসিতেছে। মধ্যে মধ্যে বুটের টো দিয়া সে এক-আধটি দূর্বার গুচ্ছ, একেবারে খুঁড়িয়া তুলিয়া ফেলিতে সচেষ্ট হইতেছে; কিন্তু এ শিকড়ের কি আর শেষ আছে—হাড়বজ্জাত নেটিভগুলোর মত। এখনও আসিল না! ধুরী গয়লা আবার তাহাকে খবর দিল কিনা কে জানে? যদি না দেয়, তাহা হইলে আজ বিকালে ঘোড়ার চাবুক দিয়া তাহার হাড়মাস আলাদা করিতে হইবে। বার রুমটির চার হাত উঁচু দেওয়াল গাঁথা হইয়াছে। সকাল হইতে কাজ আরম্ভ করিলে হয়ত বিকাল পর্যন্ত গাঁথুনীর কাজ শেষ হইয়া যাইতে পারিত।

খবর পাইয়া বিরসা ক্ষেত হইতে হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। কয়েক গজ পিছনে আসিতেছে তাহার পুত্রবধূ। গেটের উপর বসিয়া ছিল গুণ্টেন রাজমিস্ত্রী। সে তাহাদের শঙ্কাবিহ্বল জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে, ভিতরের গুগ্‌গুল গাছটিব দিকে আঙুল দিয়া ইশারা করে। না জানি কি হইবে ভাবিয়া তাহারই বুক ঢিপ ঢিপ করে। নিজের মনকে ফাঁকি দিবার জন্ত, এই অভূতপূর্ব্ব স্থিতির গুরুত্ব হাল্কা করিবার চেষ্টা করে একটি রসিকতা করিয়া; "বজ্রমন সাহেব রাগে পায়জামা হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।" সে নিজেই এই কাষ্ঠ-রসিকতার সময়োপযোগিতায় সন্দিহান; বিরসার ইহা শুনিবার মত মনের অবস্থা থাকিবার কথা নয়। গুণ্টেন আগত বিপদের কথা মনে করিয়া বিরসার পুত্রবধূকে বলে, "বোটরার মা, তুই আর ভিতরে যাস না।" বোটরার মা তাহার কথায় কান না দিয়া গেটের ভিতর ঢুকিয়া পড়ে।

যাই কি না যাই করিয়া গুল্টেনও অবশেষে কৌতুহল চাপিতে পারে না। কণিক, সুতা, মাপকাঠি লইয়া পিছনে পিছনে ঢোকে। সাহেব বাঘের মত তাহাদের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। প্রত্যাশিত আতঙ্কে বিরসা থমকিয়া দাঁড়ায়—হাতজোড় করিয়া। সাহেব কোন কথা না বলিয়া বেগুনী বোগনভিলার একটি ফুলভরা ডাল হেঁচকা টানে ভাঙ্গিয়া দেয়। ডালের গায়ে বেলের কাঁটার মত বড় বড় কাঁটা। তাহার পর বিরসার উপর যাহা চলে, বোটরার মা আর নিজের চোখে তাহা দেখিতে পারে না। হাউ মাউ করিয়া সাহেবের পা জড়াইয়া ধরিতে যায়। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে সাহেবকে অসম্বদ্ধ কথায় বুঝাইয়া চায়—"পাদরী সাহেব রবিবারে কাজ করতে বারণ করেছিলেন। তাই আমরা আসিনি। এমন জানলে কি পাদ্রীর কথা আমরা শুনি!" সে সাহেবের পা জড়াইয়া ধরিতে যায়।

"হঠো, হঠ্ যাও।"

"এই বছর এই প্রথম জল হোল কাল রাতে। তাই শ্বশুর হাল নিয়ে বেরিয়েছিল।"

"ওকালতি করতে কে বলচে? বাগো। অভী যাও।"

তাহার পর হাতকে বিশ্রাম দিবার জন্য থামে।

"কোন পাদ্রী সাহেব বলেছে? কালা পাদ্রী সাহেব বুঝি? রেভারেণ্ড টুডু? সে আমি আগেই বুঝেচি। বডম্যাস কাঁহাকা, দাঁড়াও সোজা হয়ে। গুল্টেন নিয়ে আয় খানকয়েক ইট। সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়া। গুল্টেন দে ওর মাথায় ইট ক'খান চাপিয়ে। স্যাবাথ ডে! স্যাবাথ ডে-তে ক্ষেতে কাজ করলে দোষ হয় না। পাদ্রী সাহেব বলেছিল। পাদ্রী সাহেব! মোটে ছয়খান ইট?"

গুল্টেন চমকিয়া উঠে।

"এই আওরৎ, আরও দুখান ইট নিয়ে আয়।"

বোটরার মা শ্বশুরের মুখের দিকে তাকায় না। তাকাইলেও প্রবহমান অশ্রুর ভিতর দিয়া কিছুই দেখিতে পাইত না। ইট দুইখানি যখন তাহার শ্বশুর তাহার হাত হইতে নেয়, তখন দুইজনেরই হাত থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

বিরসা ইট দুইখানিকে আগেকার ছয়খানি ইটের উপর সোজা করিয়া বসাইতে পারে নাই। সাহেব ইংরাজীতে অশ্রাব্য গালাগালি দিতে দিতে সেগুলি নিজ হাতে ঠিক করিয়া সাজাইয়া দেয়। তাহার পর ফুঁ দিয়া হাতের সুরকি উড়াইয়া রুমালে হাত মোছে। বোটরার মা আর গুল্টেনকে বলে, "যাও, আজ আর কাজ হবে না।" বোটরার মা ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া আঙুল দিয়া গেট দেখাইয়া দেয়।

"ঝাও। ঝলডী!"

এ আদেশ অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা তরাইয়ের লোকের নাই।

তাহার পর বেঞ্জামিন বাড়ি যাইবার সময় মুনিলাল মার্কারকে বলিয়া যায় যে, সে দুইটার সময় খাইয়া দাইয়া আসিবে। বিরসাকে দেখাইয়া বলে, "এই কুক্কুরীর বাচ্চাটির উপর নজর রাখিও।"

গেট হইতে বাহির হইয়া পথে তাহার মাথা একটু ঠাণ্ডা হয়। ফেলিসিয়ার স্মৃতি রাগের আগুনে ছাই হইয়া গিয়াছিল। ফিনিক্সের মত তাহার আমেজ আবার জাগিয়া উঠে। হঠাৎ দেখে জাম গাছটার নীচে বিরসার পুত্রবধূ। শ্বশুরকে ঐ অবস্থায় ফেলিয়া তাহার বাড়ি ফিরিতে মন সরে নাই। গায়ের কাপড় সামলাইয়া বোটরার মা গাছের গুঁড়ির আড়ালে যাইতে চেষ্টা করে। বেঞ্জামিনও এমনভাবে চলিয়া যায় যে সে যেন তাহাকে দেখিতেই পায় নাই। বেঞ্জামিন বোঝে যে এখনই হয়ত বোটরার মা আবার ক্লাবের গেটে পৌছিবে।··· বেশ বাঁধুনি তাহার শরীরের। ঘর্মমসৃণ দেহে কালো মার্বেলের কাঠিন্য। ফেলিসিয়ার দেহে স্বাস্থ্যের এ প্রাচুর্য কোথায়; কিন্তু

ফেলিসিয়ার সহিত তুলনা করিয়া কি হইবে। ফেলিসিয়া ফেলিসিয়া। আবলুস ভাল নয় তাহা কে বলিবে, কিন্তু আইভরি অন্য জিনিস; অন্য শ্রেণীর জিনিস। ইহা রাত্রি ও দিনের মধ্যের তফাৎ, অন্তর ও বাহিরের মধ্যের পার্থক্য।...

বুধনগড়ের রাজাসাহেবের কুকুরের খুব শখ। সম্প্রতি বিলাত হইতে একটি চালান আসিয়াছিল। কয়দিন হইল গরমের জন্য তাহাদের দার্জিলিং পাঠানো হইয়াছে। কুকুরের দেখাশুনা করিবার জন্য রাজা সাহেব বিলাত হইতে লোক আনিয়াছেন। সেই টার্নার সাহেব আর রাজাসাহেব দার্জিলিং যাইতেছেন। এখান হইতে দার্জিলিং যাইবার পথে রাজাসাহেবের কয়েকটি নিজস্ব ডাকবাঙলো আছে। সেখানে গাড়ির ঘোড়া বদল করা হয়। বুধনগড় হইতে এখানে আসিয়া প্রথম ঘোড়া বদল করা হইয়াছে। পথের দুধারে জঙ্গল বলিয়া রাজা সাহেব বলেন যে, দিনে দিনেই যাওয়া ভাল। সন্ধ্যার সময় ডিংরার কাছের কুঠিতে থাকা যাইবে। হঠাৎ সঙ্গীতজ্ঞ মোসাহেব বলদেও ঝা আসিয়া খবর দেয় যে, "জনি ওয়াকার" শহরে পাওয়া গেল না। রাজা সাহেব অন্য কোন ব্রাণ্ড পছন্দ করেন না। তাঁহার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠে। তাহা হইলে রওনা হওয়া চলে না।

"বলদেও, যাও তুমি ভাগলপুর, এখনই। সেখান থেকে নিয়ে এসো, তারপর রওনা হওয়া যাবে।"

টার্নারকে এ কথা জানানো হয়।

"এর অজস্র বোতল আমি ইউরোপীয়ান ক্লাবে দেখেছি। ডোণ্ট ওয়ারি র‍্যাজা সাহাব। চলুন, এখুনি রওনা হওয়া যাক। পথে ক্লাব থেকে দু-চার বোতল নিয়ে নিলেই হবে।" রাজা সাহেব মুখে পান জর্দা গুঁজিয়া, চাকরকে কুলকুচা করিবার জল আনিতে

বলেন। কুঠিতে আবার যাত্রার আয়োজনের সাড়া পড়িয়া যায়।

বোটরার মা শ্বশুরের জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সাহেব চলিয়া যাইবার পর হইতেই সে গেটের নিকটের কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে বসিয়া রহিয়াছে। গেটের পাশের বোগনভিলার লতাটি ডিউরেগুার বেড়ার উপর দিয়া দেখা যাইতেছে···কি চণ্ডাল এই লতার কাঁটাভরা ডালগুলো। যে না দেখিতে ফুল-গুলি! কিজন্য যে সাহেবরা এ গাছ পোঁতে বোঝা দায়। ওদের ধরণই বোঝা শক্ত। কি মারই সাহেব বিরসাকে মারিয়াছে। ভুট্টার দানা ছাড়াইবার সময়ও বোধ হয় লোকে এমন করিয়া ভুট্টা পেটায় না। সাহেবরা এ ফুলের গাছ পোঁতে বোধ হয় বটাইদারদের মারিবার চাবুক তৈয়ারী করিবার জন্য। এ কথা তাহার মনে এতদিন উঠে নাই কেন, তাহা ভাবিয়া সে আশ্চর্য হয়।

ক্লাবের ঝাড়ুদার ঝুড়িতে করিয়া কম্পাউণ্ডের ভিতর হইতে আবর্জনার রাশি আনিয়া কিছু দূরের একটি গর্তে ফেলিতেছে। গর্তের ভিতর হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে। বোটরার মা প্রতিবারেই ঝাড়ুদারের নিকট হইতে শ্বশুরের সম্বন্ধে দুই একটি খবর লইবার কথা ভাবে। সাহসে আর কুলায় না। একবার জিজ্ঞাসা করিয়াই ফেলিল।

"এই আস্তে কথা বল। ঐ আগুনের কাছে বোস্"—ঝাড়ুদারের কথায় সহানুভূতির আভাস পাইয়া বোটরার মা নিশ্চিন্ত হইয়া পাতাপোড়ানোর গর্তের ধারে বসে। প্রতিবার আবর্জনার ঝুড়ি লইয়া আসিয়া ঝাড়ুদার দুই চারিটি কথা বলিয়া যায়, একসঙ্গে বেশীক্ষণ কথা বলিবার সাহস নাই।

"ঐ মুনিলাল জানতে পারলে রক্ষা নেই। সাহেবকে বলে

দেবে যে আমিই তোকে এখানে বসতে দিয়েছিলাম। ও শালা সাহেবদের সঙ্গে খেলে কি না, তাই নিজেকে লাট সাহেব মনে করে। ওকে মুনিলাল বললে চটে যায়। এই 'ছুলাধীনে'র বেটাকে আবার মার্কার বলতে হবে।"

একবার আসিয়া বলে, "বিরসাকে বললাম যে, দে চারখান ইট নামিয়ে রেখে দি; মার্কার সাহেব বারান্দায় ঘুমিয়ে প'ড়েছে। কাল শনিবারের রাতে সাহেবদের খুব প্রসাদ পেয়েছে কিনা খেলার সময়। ওর ঘুম ভাঙলে ফের উঠিয়ে দেবোখন। তা' সে রাজী হল না। বল্লো, সাহেব সাজা দিয়েছে, তার নিমক খাই। ইমানের কাছে ঝুঠা হ'তে পারবো না। সুরুজ মহারাজ দেখছেন, ঝুঠা হ'লে গায়ে কুষ্ঠ হ'য়ে যাবে না। নে যা ইচ্ছে কর। ঘামের তো নদী বইছে। চোখ দুটোও তো এত লাল হ'য়েছে যে, এক পোয়া ভাং খেলেও অমন হয় না।"

"আমাদের কথা কিছু জিজ্ঞাসা ক'রছিল নাকি। আমার কথা, বোটরার কথা?"

"না!"

"আমাকে একবার ভিতরে যেতে দেবে? মার্কার সাহেব ঘুমুচ্ছে।"

"সাধ দেখে আর বাঁচি না। আমার এই চাকরি ক'রে বালবাচ্চাকে খাওয়াতে হবে কি না? তোকে এখানে বসতে দেখেও বারণ করিনি এই খবর জানতে পারলেই তো সাহেব আমাকে বরখাস্ত করবে।"

তাহার পর কৃত্রিম কঠোরতার মুখোস ফেলিয়া বলে, "চল্ ভিতরে। কয়েক ঝুড়ি মাটির ঢেলা নিয়ে আসবি। আর আনবি টিনটা। এই বাইরে বসে মাটি ভাঙার কাজ কর। কাদা ক'রে রাখ। দুপুরে সাহেব এসে খুশী হবে। ও দেখিস দুপুরে নিশ্চয়ই

আবার গুণ্টেনকে ডেকে কাজে লাগাবে, তোরও একটা এখানে থাকার অছিলা থাকবে। আমাদেরও ভয়ের কিছু থাকবে না।”

বোটরার মা কয়েকবার ভিতরে গিয়া মাটির চাঙড় ঝুড়িতে করিয়া লইয়া আসে। কাজের অছিলায় বারে বারে যায়, একবার টিন আনিতে, একবার মাটি ভাঙ্গিবার জন্য বাঁশের ডাণ্ডা আনিতে। বহু দূরে দেখে বিরসা দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পিছন দিক দেখা যায়। সূর্য মাথার উপর হইতে পশ্চিম দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে; সেও সেইজন্য ওই দিক মুখ করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই দিকে ফিরিয়া থাকিলে হয়ত ইশারায় কিছু কথা বলা যাইত। ইটের বোঝার ভারে, সাদাচুলে ভরা বিরসার মাথা মনে হইতেছে কাঁধের সহিত এক হইয়া গিয়াছে।

বোটরার মা গেটের বাহিরে আসিয়া মাটির ঢেলা ভাঙ্গিতে বসে। বোটরাটাই বা এতক্ষণ কি করিতেছে কে জানে। সে বুড়োর এই অবস্থার কথা জানিতে পারিলে কাঁদিয়া কাটিয়া আকুল হইবে। সে তাহার বাবাকে দেখে নাই। বোটরা যেবার হয়, সেইবারই তাহার বাবা সেই যে বেলী সাহেবের আসামের চা-বাগানে চলিয়া যায় আর ফেরে নাই। লোকে বলে বোথারে মরিয়া গিয়াছে, না হয় সে দেশের মেয়েরা যাদু করিয়া তাহাকে ভেড়া করিয়া রাখিয়াছে। শ্বশুর তাহাকে বলিয়াছিল—ও হারামজাদার কথা ভাবিস না। তারপর হইতে সে তাহার মৃতদার শ্বশুরের সংসার করিয়া আসিতেছে। কত স্থান হইতে কত খৃষ্টান ওরাওঁ ছেলে, তাহার পুনর্বিবাহের প্রস্তাব আনিয়াছে। নীলগঞ্জ হইতে তাহার বাপের বাড়ির লোকেরা এই বিষয় লইয়া কত আনাগোনা করিয়াছে। কিন্তু বুড়োর ও বোটরার কথা মনে করিয়া সে তাহাদের সমাজের রীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস

করিয়াছিল।…নিজের খাটিয়া খাইবার ক্ষমতা আছে। বুড়ো আর দশ বছর বাঁচিলেই ততদিনে বোটরা হাল ধরিতে শিখিয়া যাইবে। ভারি বুদ্ধি ছেলেটার। এখন থেকে রোজগারের দিকে ঝোঁক। এখনও বুঝি লাল গির্জা হইতে ফেরে নাই। প্রতি রবিবার সকালে সেখানে বেলী সাহেবের ঘোড়া পাহারা দেয়। বেলী সাহেব প্রতি সপ্তাহে তাহাকে এই জন্য চারটি করিয়া পয়সা দেয়। সে এই দিয়া খুকশীবাগের হাটের দিনে কত খাবার জিনিস কেনে। মার আর ঠাকুর্দার জন্য কিন্তু আলাদা করিয়া রাখা চাই। বেলী সাহেব যদি কয়েক বছর পরে বোটরাকে নিজের নীলকুঠিতে কাজ দেয়।…বজ্রমন সাহেব যাইতে দিলে তবে তো।—

ঐ বোটরা আসিতেছে। কি করিয়া খবর পাইল। ধুরী কিম্বা গুন্টেন বলিয়াছে বোধ হয়। গাঁয়ে কি কোন খবর চাপা থাকে—খবর হাওয়ায় ওড়ে। আমরা এখানে আসিবার আগেই দেখি সকলে জানে যে, সাহেব আজ চটিয়াছে।

বোটরা আসিয়া বিরসার কথা জিজ্ঞাসা করে।

"ভিতরে কাজ করছে।"

"তুমি বাইরে কাজ করছো কেন ?"

"চুপ করে থাক্। সব খোঁজে দরকার এতটুকু ছেলের।"

বোটরা চুপ হইয়া যায়। গর্ত হইতে যেখানে ধোঁয়া উঠিতেছে, সেখানে গিয়া বসে। একটি সুন্দর কাঁটাওয়ালা লতার ডাল আবর্জনার উপর রহিয়াছে। তাহাতে এখনও আগুন লাগে নাই। অনেক চেষ্টা-চরিত্র করিয়া উহাকে টানিয়া বাহির করে।

মা দেখিয়া বলে—'ওটা আবার নিয়েছিস কেন ? ফেলে দে আগুনে।

"চাবুক করবো এ দিয়ে !"

"কাঁটাওয়ালা চাবুক করে নাকি ?"

"ঘোড়া তো আর মার্‌বো না এ দিয়ে।"

কে এই ছেলের সহিত বসিয়া তর্ক করে। ভাগ্য ভাল যে এখনও খাওয়ার কথা মনে পড়ে নাই। তাহা হইলে কি আর রক্ষা ছিল। সবুজ রঙের "বেলা বাড়ার পাখিগুলি" এক ঘেয়ে হুক হুক শব্দ করিয়া চলিয়াছে। নিশ্চয়ই বেলা অনেক হইয়াছে। বুড়োর অবস্থা ভাবিয়া তাহার চোখে জল আসিয়া যায়।

ক্লাবের সম্মুখে রাজা সাহেবের প্রকাণ্ড জুড়ি গাড়িটি আসিয়া দাঁড়ায়। বোটরা হাঁ করিয়া তাকাইয়া দেখে; কি তেজী ঘোড়া। বেলী সাহেবের ঘোড়ার চাইতেও ভাল।

অদ্ভুত মুখ কালো কুকুরটার; বাঁদরের মত নাক থ্যাবড়া। কেমন সুন্দর লাল পোষাক—কোচম্যান, সহিসের। দেখিলে ভয় করে। সে যদি ঐ কোচম্যানের মত জোরে, খুব জোরে অনেক দূরে ঘোড়া চালাইতে পারিত। একেবারে উড়িয়া চলিয়াছে ঘোড়া কেবল চাবুকের শব্দে, চাবুক মারিবার দরকার হইবে না…। কিন্তু সাহেব যদি রাগ করে…

রাজা সাহেব গাড়িতেই বসিয়া রহিলেন। ক্লাবের ভিতর যাওয়া বারণ না হইলেও হয়ত এইরূপই বসিয়া থাকিতেন। টার্নার সাহেব গাড়ি হইতে নামে। বোটরার মা এক মনে কাজ করিতেছে; কোন সাহেব কে জানে। গুঁড়া মাটির মন্দিরের চূড়ায় হাত দিয়া গর্ত করিয়া টিন হইতে জল ঢালিয়া দেয়। টার্নার সাহেব দেখিতে দেখিতে যায়। মাটির ঢিবির উপরটা জল ঢালিবার পর আগ্নেয়গিরির ক্রেটারের মত লাগিতেছে। funny! বসুন র‍্যাজা সাহেব, আমি এক মিনিটের মধ্যে আপনার জিনিস নিয়ে এলাম বলে; কাম অন জিমি। সাহেব শিস দিতে দিতে কুকুরটিকে লইয়া ক্লাবের গেটের ভিতরে ঢুকেন।

রাজাসাহেব কাশীর পান-জর্দা মুখে ফেলিয়া আবার নড়িয়া চড়িয়া বসেন। রাজ্যের ভাবনা চিন্তা তাঁহার মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে—বলদেও আবার সাহেবকে দাম দিতে ভুলিয়া যায় নাই তো—

হুড়মুড় করিয়া কি যেন পড়ার শব্দ হয়।

টার্নার সাহেব আর কেরানীবাবু ক্লাবের অফিসঘরের জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখে। একজন লোক মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গিয়াছে ; একরাশ ইটের বোঝা ইতস্ততঃ ছড়ানো। মুনীলাল মার্কার চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে দৌড়িয়া আসে। ঝাড়ুদার আসিয়া চেঁচামেচি আরম্ভ করে—"বিরসা, এই বিরসা"। বিরসা সাড়া দেয় না। "আচ্ছা লোক তো।" অচৈতন্য বিরসার নাক দিয়া রক্তের ধারা বহিয়া একখানি ইটের নীচে জমিতেছে। ইটখানির গায়ে রক্ত চাপ বাঁধিয়া কাল হইয়া উঠিল।

টার্নার সাহেব, কেরানীবাবু, মার্কার মিলিয়া ধরাধরি করিয়া বিরসাকে সারি সারি ইজিচেয়ার পাতা বারন্দায় তোলে। কলেক্টর ভার্নেডী সাহেব নিশ্চয়ই সদরে নাই—থাকিলে এতক্ষণ ক্লাবে আসিত, বিয়ার টানিবার জন্য। টার্নার সাহেব ঝাড়ুদারকে পাঠায়—সিভিল সার্জ্জন ও ছোট বেঞ্জামিনকে ডাকিতে। মার্কারকে চোখে মুখে জল দিতে বলে। তাহার পর ক্লাবে নগদ দাম দিয়া কয়েকটি বোতল লইয়া কেরানীবাবুকে গাড়িতে পৌঁছাইয়া দিতে হুকুম করে।

"কাম অন জিমি!"

বিরসার আর জ্ঞান হয় নাই।

রেভারেণ্ড টুডুর অনুরোধে বুড়ী বেঞ্জামিন বিরসার কবরের উপরের প্রস্তরফলকের খরচ দেন। যত দোষই থাকুক না কেন,

আফটার অল বিরসা ছিল ক্রিষ্টিয়ান। তাহার নাতি বোটরার হাতে মেমসাহেব একটি টাকা গুঁজিয়া দেন মিঠাই খাইবার জন্য। কৃতজ্ঞতার আতিশয্যে বোটরার মা ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠে।

বুড়ী মেম তাহাদের কুঠির আউট হাউসে বোটরা আর বোটরার মা'র থাকিবার জায়গা করিয়া দেয়। সেখানে সারি সারি ঘর ধোপা, আর্দালী, বাবুর্চি, সহিস, কোচম্যানের জন্য। তারই মধ্যের একটি ঘর বোটরার মা পায়। কেই বা তাহাদের জমি দেখিবে; তাই সাহেব তাহাদের জমি তুল্লা মাঝিকে দিয়া দেয়।

মানুষ বদলায়। ফেলিসিয়া টমসন পাথর নয়। তাই বদলাইয়াছে। টার্নার সাহেবের খাস বিলেতে বাড়ি। তাহার সহিত বেঞ্জামিনের তুলনা? কোথায় ব্রিষ্টল শহর, আর কোথায় মরগামা কুঠি।

বোটরার মা ছিল পাথর। সেও বদলাইয়াছে। সময়ে কিনা হয়। বুড়ো বেঞ্জামিন মারা যাইবার পর ছোট বেঞ্জামিন বোটরাকে বলে "নৌকরী করোগে, রোজগার?"

বোটরা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানায়। সাহেব বলে—"চালাক ছোকরা।" ক্লাবে টেনিস বল কুড়াইবার ও ছোটখাটো কাজকর্ম্ম করিবার চাকরি সে পাইয়া যায়। সেখানেই থাকিবার ব্যবস্থা হয়। ইহা লইয়া ক্লাবের সহকর্ম্মীদের ঠাট্টার অর্থ সে বুঝিতে পারে না। কেবল এটুকু বোঝে যে, সাহেব কোন মতলবে তাহাকে কুঠির ঘর হইতে সরাইয়া এখানে স্থান দিয়াছে, ইহাই বিদ্রূপের ইঙ্গিত।

এরূপ কত নীরব আর্তির বিচ্ছিন্ন কাহিনী, কত জলুসের নাগর-দোলার আবর্ত মিলাইয়া ইহার পরের আণ্টাবাংলার ইতিহাস। তরাইয়ের ভিজামাটির কালা আদমীর এ সবই সহিয়া গিয়াছিল; কিন্তু

প্রতিবাদ জানাইল কাল কয়লা—তাও এখানের নয়, জার্মানীর। তাহার পর কোথা দিয়া কি হইয়া গেল। এই প্রতিবাদের সংঘাতে নীল কাচের জার হইতে ছিটকাইয়া বাহির হইয়া পড়ে অজ্ঞাত-জগতের একখণ্ড,—উদার উন্মুক্ত আলোকে।

দুষ্টক্ষত শুখাইলে কি আর মাছি সেখানে থাকে? ঘোড়াপাগল বেলী সাহেব কুঠি বেচিয়া অষ্ট্রেলিয়ায় চলিয়া যায়। তামাকখোর লিউইস সাহেব যায় কুমায়ুনে—ফলের বাগান করিতে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যুগে শ্রীরামপুরের যে পামার্স ব্যাঙ্কের নোট চলিত, তাহাদের বংশের টেডি পামার্স সরস্বৌনীবিজনিয়ার কুঠি বিক্রয় করে। তাহার পর যে গয়লার মেয়েকে ক্রীশ্চান করিয়া বিবাহ করিয়াছিল, তাহাকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া যায়। আরও কে কোথায় চলিয়া যায়, কে তাহার হিসাব রাখে। তাহাদেরই হিসাব রাখা যায়, চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে যাঁহারা ঘটা করিয়া টিকিট মারিয়া কুঠির জিনিসপত্র, ছবি নিলাম করিয়া যান।

গীর্জাগুলির সম্পত্তি বাড়িয়া ওঠে। জেলার উকীল মোক্তারের গৃহে সাহেবদের কুঠি হইতে কেনা, অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আবর্জনা জমিয়া উঠে। আন্টাবাঙলা অনাবশ্যক ফার্নিচারে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে।

এই অর্থহীন ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে বোটরা বড় হইয়া উঠে। প্রত্যহ সকালে ফাদার টুডুর কাছে যায়। পাদরী সাহেবের স্ত্রী তাহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেন—"বোটরা তোর মার কাছে যাস না?"

"সাহেবের কুঠিতে তো আন্টাবাঙলার কাজে হরহামেশা যেতে হয়।"

পাদরী সাহেব চোখ টিপিয়া স্ত্রীকে ইসারা করেন—এ প্রসঙ্গ থামাইয়া দিতে।

বলেন—"আজ যে মাসের হলো তিন তারিখ। তোমার ঠাকুরদার

মরার তারিখ আঠারই না? ভগবান তাঁর আত্মাকে শান্তিতে রাখুন। আর মাত্র পনরদিন বাকি। সেদিন সকালে কিছু খেয়োনা। পবিত্র মনে বিরসার কবরের উপর ফুল দিতে হবে। আর প্রার্থনা করতে হবে।"

বোটরা বোঝে যে, ফাদার তাহার মার প্রসঙ্গ চাপা দেবার চেষ্টা করিতেছেন। কেন, তা-ও সে জানে। রাজ্যশুদ্ধ সবাই জানে, আর সে জানিবে না? তবে তাহার সঙ্গীদের মধ্যে, আর কেহ ইহা লইয়া মাথা ঘামায় না। পাদরীগিন্নীর এ বিষয়ে এখনও এত কৌতূহলে সে সঙ্কুচিত হইয়া যায়। মা'র সহিত দেখা তাহার আর হয় না বলিলেই হয়। দুই একদিন দেখা হইলে তাহার মাথায় তেল এবং পরনে রঙীন শাড়ী দেখিয়াই বুঝিতে পারে যে, সে বেশ সুখেই আছে।

নীল চশমা খোলার পরও চোখে অনেকক্ষণ রঙের রেশ থাকে। মোবার্লি, বেটিস, জনষ্টন, কীডের দল গ্রামের কুঠি ছাড়িয়া সদরে আসিয়া বাসা বাঁধে, কিন্তু চোখে তাহাদের তখনও পুরাতনেরই আমেজ। নীলের চাষ গিয়াছে, কিন্তু জমিতো যায় নাই। রাতারাতি তাহারা পাইতে চায় বনেদী জমিদারের আভিজাত্য। টমটমে চড়া মোবার্লি সাহেব নিজেদের পরিবারকে গড়মোগলাহার কুমার সাহেবের পরিবারের সমান মনে করে। বুধনগড়ের রাজা সাহেবকে নেপাল সরকারের মোরঙ্গের রিজার্ভ ফরেষ্টে প্রতি বৎসর শিকারের অনুমতি দেওয়া আছে। বেটিস সাহেবেরও এ অধিকার চাই। মোরঙ্গ জেলার বড়াহাকিমের নিকট হইতে তাঁহার দরখাস্তের জবাব আসে না। রামবাগের রাস্তার সারি সারি নূতন বাংলো ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠে; আর নূতন ধনীর ঊদ্দণ্ডতা লইয়া বাড়িয়া উঠে। চিরনবীন আণ্টাবাংলা। ক্লাবে

জমিয়া উঠে অহোরাত্র উৎসব। সময় নাই, অসময় নাই, অষ্টপ্রহর ভিড় লাগিয়াই আছে। নীলের কাজ বন্ধ, কিন্তু কাহারও এক মিনিট নিশ্বাস ফেলিবার ফুরসত নাই! ক্লাবের মিনাবাজারে ষ্টল খুলিবার ব্যবস্থা, বলনাচের পোষাক তৈয়ারী, নাচের মহলা, চাকা-ওয়ালা জুতা পরিয়া বায়ুগতিতে ছুটিবার অভ্যাস, কাজের কি অন্ত আছে? আণ্টাবাংলার পিছনের মাঠের মধ্যে উঁচু করিয়া মাটির ঢিবি প্রস্তুত হইয়াছে; এই চাঁদমারীতে বন্দুকের নিশানায় হাত মক্স করা হয়। তালের ডেঙ্গোর একদিক সরু করিয়া বোটরা মাঠের মধ্যে হাতুড়ি দিয়া ঠুকিয়া পোঁতে। টড কিড বেঞ্জামিনের দল একে একে ঘোড়া ছুটাইয়া বল্লম হাতে এইদিকে আগাইয়া আসে। বোটরা ভয়ে দূরে সরিয়া যায়। সে জানে যে বেঞ্জামিন ছাড়া আর কেহই এই শুয়োর মারিবার খেলায় দক্ষ নয়। ঠিক তাই। বেঞ্জামিন সাহেবের বয়স হইলেও এখনও সব খেলাতেই সকলের সেরা। টমসন সাহেবের "বেটী"র কেন যে তাহাকে পছন্দ হয় নাই কে জানে। এখনও কত মেম রাত্রিদিন তাঁহার পায়ের তলায় লুটায়।

রবিবার বিকালে আগের যুগে আণ্টাবাংলায় প্রাণের অফুরন্ত প্রাচুর্যের সন্ধান পাওয়া যাইত। এ যুগে রোজই রবিবার। ডিউ-র‍্যাণ্ডার বেড়ার ধারের জুড়ি ফিটনের মেলায় একখানি দুইখানি করিয়া হাওয়া গাড়ির অনধিকার প্রবেশ আরম্ভ হইয়া যায়।

এই অন্তহীন আনন্দ উচ্ছলতার যুগেই বোটরা ফুর্তি করিয়াছে প্রচুর। ক্লাবের উর্দি পাগড়ি পরা লোকের আবার ফুর্তির অভাব।... রঙ-বেরঙের বিলাতী মদ যত পার খাও। বেঁটে, মোটা, চোকো, খাঁজ কাটা কত রকমের বোতল। তার উপর পড়িয়াছে নূতন বসানো বিজ্‌লী বাতির আলো। সকাল হইতে খাইতে আরম্ভ করিত বোটরা। যে কোনো সাহেবের হিসাবে চড়িয়া। কে তাহার

খোঁজ রাখে। কেবল কেরানীবাবুকে খুশী রাখিতে পারিলেই হইল। বোটরার মনে পড়িয়া যায় যে, প্রতিবারের মত এবারেও ফাদার টুডু ঠাকুর্দার মৃত্যু তারিখে একরাশ বোগনভিলির ফুল কবরের উপর রাখিয়াছিলেন। পাথরের উপরের লেখাটা পড়িয়া অন্য বারের মত বলিলেন, "একজন সত্যিকারের ক্রীশ্চান ছিল বিরসা। তার নাতি তুমি। আজ থেকে প্রতিজ্ঞা কর, মদ ছেড়ে দেবে।" সে প্রতিজ্ঞা করে, কিন্তু আন্টাবাংলায় গিয়া আর নিজেকে ঠিক রাখিতে পারে না।

বেশ চলিয়া আসিতেছিল। হঠাৎ বোটরা, নিশু, মুনীলাল অনুভব করে যে, আন্টাবাংলায় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দদীপালী ম্লান হইয়া আসিতেছে। ইহাতে আবিষ্কারের আনন্দ নাই। তাহারা হিসাব নিকাশ খতাইয়া দেখে। কালাবালুয়া কুঠির জমিদারী কিনিয়াছেন রাজদ্বারভাঙ্গা, সরসৌনী কুঠির জমিদারী গিয়াছে বুধনগড়ের রাজার হাতে। গড়মোগলাহার কুমার সাহেব কিনিয়াছেন রফিচক কুঠির পত্তনি, কিরতাহা কুঠির মিলিক কিনিয়াছে কাটিহার চালের কলের তোলারাম মারোয়াড়ী। রামবাগের পথের ধারের নূতন বাংলোগুলির সাহেবদের হিসাব তাহারা আঙ্গুলের কর গুনিয়া করিতে আরম্ভ করে। রবিন্সন সাহেব জয়ন্তীতে চায়ের বাগান কিনিয়াছে—লালমণিরহাট বিরাট জংসন ষ্টেশন, সেখান দিয়া যাইতে হয়।—আচ্ছা উত্তর দিক হইতেই ধর। জিলেপ্পী সাহেব গিয়াছে শিলিগুড়ি। সেখানে করিয়াছে বরফের কল। রোজ কলিকাতায় ছাল ছাড়ানো শুয়োর বরফ ঢালিয়া চালান দেয়; দার্জ্জিলিংয়ের হোটেলে আর কলকাতার সাহেবী হোটেলে খুব চলে কিনা তাই। চলতো বটে এখানেও দশ বছর আগে। জিলেপ্পী সাহেব এখানেইতো হাত পাকায়।···তারপর ধর

রবার্টসনের বাড়ি। থাকবার মধ্যেতে মেয়ে জামাই। জামাই চাকুরি করে মোগলসরায়ে। বড় চাকরি। এবারে যখন সম্পত্তি বেচিতে আসিয়াছিল তখন ক্লাবের সকল কর্মচারীকে দেয় পাঁচ টাকা করিয়া, কেবল বোটরাকে দেয় দশ টাকা।...ব্যাপার কি বল বোটরা এখনও। সকলে হাসাহাসি করে।...তারপর ধর চার নম্বরের কুঠি। ফিপসনের মেয়ে—আরে সব কুঠিতেই কি মেয়ে। সে মাষ্টারনীর কাজ নিয়ে গিয়েছে ম্যাকলুসকীগঞ্জে। বাওয়াদের ইস্কুলে।...সব সাহেব মেমই বোটরাকে ভালবাসে।

তাহার পর বোটরা দেখিয়াছে বেঞ্জামিন ছাড়িবার পর ক্লাবের সেক্রেটারীর পদের জন্য লোক পাওয়া যায় না। প্রত্যহ টেনিস খেলিবার লোক হয় না। বাঙ্গালাবাবুদের লাইব্রেরীর চাকর রামলালের সহিত তাহার পথে দেখা হয়। আগে হইলে বোটরা তাহার সহিত কথাও বলিত না—এখন যাচিয়া কথা বলে। একথা সেকথার পর সেও বলে যে তাহার চাকরিরও ঐ একই অবস্থা। তোমারতো তবু চলছে, আমার তো খতম হয়ে গিয়েছে। কবে থেকে যে লাইব্রেরী উঠে গেলো বুঝতেও পারলাম না।...একই অবস্থা! সমবেদনায় বোটরার মন উদাস হইয়া উঠে। সে রামলালকে আশ্বাস দেয়—"আবার কোথাও চাকরি জুটে যাবে।" রামলাল বলে, "উকীলবাবুরা নাকি নয়া ক্লাব করবে শুনছি। বিনোদবাবু কথাতো দিয়েছেন।" বোটরা ভাবে আণ্টাবাংলাই চলে না, তার উপর আবার নূতন ক্লাব, কিন্তু রামলাল দুঃখিত হইবে বলিয়া কিছু বলে না...

মার্কার সাহেব বলে যে বহুদিন হইতে বিলিয়ার্ড টেবিলের উপরের ফেল্ট ছিঁড়িয়া গিয়াছে—বদলানো হইতেছে না—কাহারও সেদিকে নজর নাই।...চোখের উপর বোটরা মুনীলাল কেরানীবাবু দেখেন আণ্টাবাংলার গল্‌ফ্ খেলিবার মাঠ—যাহা বেলী সাহেব

ক্লাবকে দান করিয়াছিল—রেল কোম্পানি গ্রহণ করে মোবার্লিগঞ্জ লাইন করিবার জন্য…লোক হয় না। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সিরিল সাহেবের টেনিসের ঝোঁক। তাঁহার চেষ্টায় প্লান্টারস্ ক্লাবের নিয়মাবলীতে পরিবর্তন করা হয়। গড়মোগলাহার কুমার সাহেবকে ক্লাবের প্রেসিডেন্ট করিয়া দেন। এই মিটিংএর আগে কত বাদ-বিবাদ! বোটরা, মুনীলাল ভয়ে তটস্থ হইয়া দূর হইতে দেখে। সাতজনতো মেম্বর। ক্রীড সাহেব টেবিল চাপড়াইয়া বলে যে, সে ইহার বিরুদ্ধে। মিটিংএ প্রস্তাবটি পাস হইবার পর সে খস্‌খস্ করিয়া কাগজে তাহার সদস্যপদে ইস্তফা দিবার চিঠি লেখে। চিঠিখানি টেবিলে সভাপতির সম্মুখে ফেলিয়া নাটকীয়ভাবে সকলের নিকট হইতে বিদায় নেয়। তাহার পর তাহার ভগ্নী বৃদ্ধা মিস ক্রীডকে লইয়া গাড়িতে যাইয়া বসে। "কোঠী"। রামবাগের 'রেনট্রী'র এভিনিউয়ের অন্ধকারে গাড়ির আলোর লাল বৃত্তদুইটি অদৃশ্য হইয়া যায়।

হাত দিয়া কি বানের জল আটকানো যায়। সিরিল সাহেবের চেষ্টা সত্ত্বেও আন্টাবাঙলার হৃত গৌরব ফিরিয়া আসিল না। তিনি হঠাৎ বদলি হইয়া যাইবার পর আসিলেন ফজল আহম্মদ কলেক্টর হইয়া। ইঁহারই উৎসাহে সরকারী উকীল রায় বাহাদুর স্থাপিত করেন কসমোপলিটান ক্লাব। বোটরারা বলে কসমপলটন ক্লাব। বুধনগরের রাজা সাহেব হইলেন ইহার প্রেসিডেন্ট। জেলার সব বড় লোকই হয় উহার সদস্য। নূতন দ্যুতিতে কসমোপোলিটান ক্লাব সমৃদ্ধ হইয়া উঠে এবং সেই অনুপাতেই আন্টাবাঙলা অধিকতর শ্রীহীন হইয়া পড়ে। লাইব্রেরীর পুরানো চাকর রামলাল হয় নূতন ক্লাবের হেড আরদালী। এত নৈরাশ্যের মধ্যেও বোটরা ভাবে আহা বেচারা রামলাল, লোকটা ভাল!…

কমিশনর সাহেব, আর পাটনা হইতে যে সব বড় বড় অফিসার আসেন, সকলেই সার্কিট হাউস হইতে বিকালে কসমোপোলিটান ক্লাবেই যান। হরিয়া, বিশনাথ, চামারী, নথুনী যতগুলি দুসাধের ছেলে আন্টাবাঙলায় টেনিসের বল কুড়াইত, সকলেই বেশী মাইনেতে কসমোপোলিটন ক্লাবে, চাকরি লইয়া চলিয়া যায়।··· 'নিমক হারামের দল!' চরম আঘাত পড়িল যেবার লাটসাহেব শিকারে আসিয়া কসমোপোলিটান ক্লাবের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তখন হইতেই প্রেসিডেন্ট কুমার সাহেব, আণ্টাবাঙলার সদস্যপদে ইস্তফা দেন।

সেই কি আজকের কথা হইল। আন্টাবাঙলার বাররুম উঠিয়া গেল, খরচে পোষায় না। বোটরার থাকিবার স্থান হইল সেই ঘরে। সে একাই হইল দারোয়ান, মার্কার আরদালী, চাঁদা সংগ্রাহক। শতচ্ছিন্ন উর্দির উপর ইংরাজীতে 'প্লাণ্টারস্ ক্লাব' পিতলের তকমাটি সে সর্বদা ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার করিয়া রাখে, কসমোপোলিটনের রামলালের কাছে ছোট না হইবার উদ্দেশ্যে। ঐ ক্লাবের কেরানী বাবু ফুসলানি দেন, তাহাকে আণ্টাবাংলা ছাড়িয়া সেখানে কাজ নিবার জন্য। কিন্তু এক দুর্নিবার আকর্ষণ তাহাকে টানিয়া রাখে এই ক্লাবে। পুরাতন বার-রুম স্বর্গরাজ্য হইতেও মনোরম। বোগন-ভিলি গাছের ডালগুলি যখন ফুলের ভারে নুইয়া পড়ে, তখন তাহারও মন যেন কত স্মৃতির বোঝায় ন্যুব্জ হইয়া আসে। লোকে বলে যে, সে পাঁড় মাতাল—নেশায় চুর হইয়া অষ্টপ্রহর কোন রঙীন আমেজে থাকে, কাহারও বাপের সাধ্য নাই তাহা বুঝিবার। বার-রুমের উঁচু বেদীটির উপর তাহার শুইবার জায়গা। যখন এই ঘরে কেরানী বসিতেন···সোডার বোতল, কাঁচের গেলাস, রঙবেরঙের নানা সাইজের নানা প্রকারের বোতল···ছুটি পাইলেই সে বেদীটির

উপর বসে। ঝাড়ন দিয়া হাওয়া খাইতে আরম্ভ করিলেই কেরানী বাবু হাসেন—'যে মতলবে বসেছো সে আর আর আজ হ'চ্ছে না, আজকাল বড় কড়াকড়ি হিসেবের।' তাহার পর বকশিসের পয়সা হইতে চার আনা পয়সা দিলেই হইল। সে আজকালকার রদ্দী মাল নয়। বড় ভাল লোক ছিল কেরানী বাবু···

ক্লাবের দেওয়ালে চুনকাম করা হয় না। দেওয়ালের শ্যাওলার ছাপগুলি কিম্ভূতকিমাকার প্রাগৈতিহাসিক যুগের জানোয়ারের ন্যায় দেখিতে—যাহারা পরিবেষ্টনীর সহিত সংঘর্ষে টিকিতে পারে নাই। আন্টাবাঙলার চালে সোনার রঙের খড় নাই; সামান্য বৃষ্টিতেই, যে বিলিয়ার্ড টেবিলটির উপর ঝাড়ুদার শোয়, তাহার উপর টিপ টিপ করিয়া জল পড়ে। ডিউর‍্যাণ্ডার বেড়ার ফাঁক দিয়া গরু ঢোকে। আটফাটা টেনিস কোর্টের উপর ঝাড়ুদারের স্ত্রী আমসি শুখাইতে দেয়। বোটরা দেখিয়া রাগে জ্বলিয়া উঠে—"কাল থেকে ঘুঁটে দিস টেনিস কোর্টের উপর।" বকিবার সময় তাহার চোখে জল আসিয়া যায়।

স্বাভাবিক মৃত্যুর হাত হইতে "ক্লাব"কে বাঁচাইয়া দিল ১৯৩৪ এর ভূমিকম্প। কস্‌মোপোলিটান ক্লাবের বাড়িও ভাঙ্গিয়াছিল; কিন্তু কলেক্টর সাহেবই সরকারী রিলিফ ফাণ্ড হইতে তাহার মেরামতের টাকা দেন। বুড়ো জসলীন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে আণ্টা-বাঙলা মেরামতের জন্য রিলিফ ফাণ্ড হইতে টাকা চাহিতে যান। কলেক্টর সাহেব বলেন "আপনিও তো একজন ধনী জমিদার; কিছু টাকা নিজের ক্লাবের জন্য খরচ করুন না। ভূমিকম্পে ভাঙা সরকারী বাড়ির মেটিরিয়াল নিলামে কিনুন। সস্তায় হ'য়ে যাবে।" জসলীনের মনে পড়ে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের হর্ন সাহেবের বদলির কথা। এখন তাহাদের সব সহিয়া গিয়াছে, ইহাকে আর ঠিক

অপমান বলিয়া মনে হয় না, মনে হয় ইচ্ছাকৃত পক্ষপাত মাত্র। মাড়িতে মাড়ি ঘষিয়া বুড়ো জসলীন কলেক্টরের বাঙলো হইতে বাহির হইয়া আসে। কসমোপোলিটান ক্লাবের বাড়ি নূতন করিয়া হয়। নীলকুঠির যুগের কঙ্কালের মত আণ্টাবাঙলার দেওয়ালের অবশেষ দাঁড়াইয়া থাকে। কসমোপোলিটানের সেক্রেটারী বোটরাকে চাকরিতে লইবার জন্য নিজে তাহার কাছে আসেন। তাঁহার সঙ্গে নিমকহারাম নথুনীকে দেখিয়া বোটরা আগুন হইয়া উঠে। কোন কথা না বলিয়া সেলাম করিয়া জসলীন সাহেবের বাড়ির দিকে চলিয়া যায়। জসলীন সব বোঝে। তাহাকে নিজের মোটরের ক্লীনারের কাজে বাহাল করে।...

"বিজলীর ঘরের পাশের ঘরে থাকবি।"

বোটরা সাহেবের নিকট কাঁদিয়া কাটিয়া আণ্টাবাংলার কম্পাউণ্ডে থাকিবার অনুমতি করাইয়া লয়। কতটুকুই বা দূর সাহেবের কুঠি হইতে। দরকার হইলে রাতবেরাতে ডাকিয়া পাঠাইলে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগিবে না। সাহেব নিজেই খড় বাঁশ দিয়া আণ্টাবাংলার হাতায় তাহার জন্য ঘর তুলিয়া দেন।

দুই বছরের মধ্যে বোটরা সাহেবের মোটর চালাইতে আরম্ভ করে। তাহার হাত সামান্য কাঁপে। কিন্তু সে মনের মত কাজ পাইয়াছে। ছোট বেলা হইতে তাহার সখ, জোরে, হাওয়ার মত গতিতে ঘোড়া ছুটাইয়া লইয়া যাওয়া। হাওয়া-গাড়িতে তাহার সে বাসনা মিটিয়াছে। সুবিধা পাইলেই পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর—মোটরের গতি বাড়াইয়া দেয়। লোক ভয়ে পথের পাশে গিয়া দাঁড়ায়—"আজকে একটু বেশী প'ড়েছে পেটে।"

মোটর চালাইবার সময় যেরূপ নিকটের জিনিসগুলি পিছনে

ছুটিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়, অথচ দূর দিগন্তের স্থির দৃশ্য চোখের সম্মুখে অপরিবর্তিত থাকিয়া যায়, বোটরার মনও সেইরূপ সুদূর স্মৃতির অপরিবর্তিত রসের মধ্যে ডুবিয়া থাকে; আজকালকার কথা তাহার মনে সাড়া জাগায় না। বর্তমান পারিপার্শ্বিকের মধ্যে কেবল মাত্র আন্টাবাঙলার কন্ধকাটা ভাঙ্গা দেওয়ালগুলি দেখিলে তাহার মনের ভিতরটা যেন মোচড় দিয়া উঠে। টেনিসকোর্টের ফাটলের ভিতর দিয়া কালকাসুন্দির গাছ বাহির হয়। বোগনভিলির গাছটি মরিয়া গিয়াছে। বোটরার বুড়ী মার সহিত একদিন দেখা হইয়াছিল। সে এখন দিনরাত বিড় বিড় করিয়া বকে—"টমসন সাহেবের সেই আঁটকুড়ি মেয়ে, যে কুত্তাওয়ালা সাহেবকে দেখে ঢলে পড়েছিল, সেইটাই তো সাহেবকে খেলো। শুনছিস বোটরা, আমি একদিন খুড়পি নিয়ে গিয়েছিলাম, তোর আণ্টাবাঙলায়। তুই তখন ঘুমুচ্ছিস। ফুলের গাছটার নীচে এত্তোখানি, হিঙ পুঁতে দিয়েছিলাম। কতদিন ধরে বলে আমি হিঙ জমাচ্ছি—কাবলীওয়ালাদের কাছ থেকে কিনে কিনে…"

তাহার নেশার সময় উতরিয়া যাইতেছে, এখন কে এই বুড়ীর ভ্যাজর ভ্যাজর শোনে…"একা কুঠি যেতে পারবিতো?"…তারপর আপন মনে বলে: আমারই চুল অর্ধেক পেকে গিয়েছে তো বুড়ীর চুল একটিও কাল থাকবে কি ক'রে।

যুদ্ধ লাগিবার পরের কথা। জেলার যত লোক মোটর চালাইতে জানে, পুলিস সাহেব তাহার হিসাব লইতেছেন। এ খবর আবার বোটরাকে দিল বুড়ো জসলীনই। বলে "নাম লেখাও। আমি জমিদারী টমিদারী বেচে কার্সিয়াংএর বাড়িতে গিয়ে থাকবো মনে করেছি। তুমি সেণ্ট্রাল পি, ডবলু ডি-তে চাকরী নাও। তারা আসছে সড়ক বানাতে। একেবারে গঙ্গা থেকে আসাম, শিলিগুড়ি

দিয়ে। মোবার্লীর কথা মনে আছে না? মোবার্লিগঞ্জ কুঠির? তাকে বলে দেবো তোমার কথা।"

"এখানে থাকতে পাবো তো?"

"তা বলা যায় না। যেখানে কাজ হবে সেখানেই থাকতে হবে।"

"তাহলে আমাকে আন্টাবাঙলার হাতা ছাড়তে হবে।"

সাহেব হাসিয়া ছড়ি উঠাইয়া বলে, "বাগো, ফের ঐ কথা"—

বোটরা কিছুদূরে গেলে বলে, "আমি বলে দেবো যত বেশী দিন সম্ভব এখানেই রাখবে।"

সেন্ট্রাল পি-ডবলু-ডি এখানে অফিস খুলিয়াছে। যুদ্ধের বাজারে লোক পাওয়া যায় না। প্রচুর বেতন দিয়া প্রচুর অকর্মণ্য লোককে বিশেষজ্ঞ বলিয়া ভর্ত্তি করিতেছে। উপরের হুকুম—আজকালকার যে রাস্তা শিলিগুড়ি হইয়া আসামের দিকে গিয়াছে, তাহার টার-ম্যাকাডাম অংশ মোটে সতের ফুট—যুদ্ধের জন্য নেহাতই অপ্রশস্ত। দুই পাশে আড়াই ফুট করিয়া বাড়াইয়া রাস্তার পাকা অংশকে বাইশ ফুট চওড়া করিতে হইবে। তাহা না হইলে দুইখানি মিলিটারী গাড়ি একসঙ্গে পাশাপাশি যাইতে পারে না। উপরের হুকুম সাঁওতাল পরগণা হইতে পাথর কিম্বা ঝরিয়া হইতে পিচ পাইতে দেরী হইবে; ওখানেই ইট কেনো, যেমন করিয়া হউক, যত শীঘ্র সম্ভব কাজ আরম্ভ কর; লোক্যাল বডিজ হইতে জিনিসপত্র যাহা পাও লও।

কলেক্টর সাহেব ক্লাবের একমাত্র পুরাতন সদস্য জসলীনকে বলিয়া আন্টাবাঙলার ভাঙা দেওয়াল, ইট, কাঠ সিদ্ধি রোড কন্ট্রাক্টর পীরুমলকে বিক্রি করেন। টাকাটা জেলার রেডক্রস ফণ্ডে জমা হইবার কথা।

বোটরা সেণ্ট্রাল পি ডবলু ডি-তে ট্রাক চালাইবার কাজ পাইয়া যায়। মাহিনা ভাল। আক্রাগণ্ডার বাজারে, না হইলে মদের খরচ চালানো শক্ত হইয়া পড়িত। তাহা ছাড়া পেট্রোল বিক্রির উপরিটাও আছে।

সে নিজেই আণ্টাবাঙলার ইট, সেণ্ট্রাল পি ডবলু ডি'র ট্রাকে বোঝায় করিয়া লইয়া যায় দিনের পর দিন। অন্য ঘর-গুলির বেলায় শাবলের দরকার হইত; বার-রুমটির কাদার গাঁথুনি, কিছুরই দরকার হয় না। হাত দিয়া ঠেলো, হাতুড়ি দিয়া পাশে ঠোকো, ইট সরিয়া আসিবে। তাহার পর মোহনিয়ার মা আর রবিয়ার বৌ ইটগুলি মাথায় করিয়া দূরে লইয়া গিয়া সাজায় থাকের পর থাক। মাথায় ছয়খানির বেশী ইট লয় না; নিশ্চয়ই ফাঁকি দিতেছে। যাক, গরীব মানুষ যুদ্ধের বাজারে ত্ব'পয়সা রোজগার না করিলে ছেলেপিলেকে কি খাওয়াইবে। ছোটবেলা হইতে বোটরার মনে ধারণা হইয়া গিয়াছে, মাথায় আটখানি করিয়া ইট লওয়াই নিয়ম।

বার-রুমের তাহার বেদীটি যেদিন ভাঙ্গা হইল, সেদিন অশ্রু চাপিতে পারে নাই। কতদিনের কত স্মৃতি উহার সহিত মিশানো। শীতকালে গরম, আর গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা—যে উহার উপর বসিয়াছে সেই জানে। মোহনিয়ার মাকে বলিয়া সে বেদীর ইটগুলিকে, অন্য ইট হইতে আলাদা সাজাইতে বলে। "কাদা একেবারে সাফ করবি। অন্য ইটের মত না। আস্তে ফেলিস। ভাঙলে তোর মাথা ভাঙবো।"

রবিয়ার বৌ, মানুষ অপেক্ষা ইটের অধিক দরদের জন্য তাহাকে ঠাট্টা করে। ট্রাকে করিয়া সে ইটগুলিকে ফেলে কাপ্তেন পুলের আগের পাকুড়গাছটির তলায়। এই জায়গাটি তাহার মনে থাকিবে।

ট্রাকের মজুররা বলে—"ঠিকেদার সাহেব বকবে। লাইনের মোড়ে ইট ফেলেছো, তারপরই এখানে ফেললে; মধ্যে বাদ পড়ে গেলো যে।"

"ট্রাকের আর দু' ট্রিপ মাঝের জায়গার জন্য দিলেই হবে। তোর অত ভাবনা কিসের। অমন ঢের ঠিকেদার দেখেছি। দু' গ্যালন তেল পেলেই সব রাগ জল হয়ে যাবে।"

পাথরের টুকরা নাই, খোয়া নাই, ঝামা পাওয়া যায় না; মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ার বলিয়া গেলেন "দেরী ক'রোনা। পিচের দুপাশে ইট দিয়ে তিন ফুট ক'রে বাড়িয়ে দাও। মাঝের টারম্যাকাডামের উপর পেটি প্যাচ রিপেয়ার করো। দুপাশের নূতন অংশে ইট পেতো না, লম্বালম্বি খাড়া ক'রবে, এই এমনি ক'রে। দেখছো না, পাশাপাশি তীরের মাথা রাখলে যেমন দেখতে হয় তেমনি দেখতে হবে। জলদী চাই—সেকেণ্ড লাইন অব ডিফেন্সের পথ—ভায়া রাজমহল টু রাঁচী। এক মিনিটও দেরী ক'রো না। এই দিয়ে তোমাদের এফিসিয়েন্সি বিচার হবে, যুদ্ধের পর চাকরি স্থায়ী করার, না করার বিচার হবে।"

যেদিন পাকুড়গাছের নিকট ঠিকেদারের লোকেরা টারম্যাকা-ডামের দুই পাশে ইটগুলি পোঁতে, সেদিন ঢোঁড়া বিড়ি খাওয়ার অছিলায় সেখানে ট্রাক থামায়।

হাত পা কাঁপার রোগ তাহার বহুদিন হইতেই হইয়াছে। কিন্তু সে দেখে যে কাপ্তেন পুলের নিকট আসিলেই তাহার ষ্টীয়ারিং আর ঠিক থাকেনা। কেন তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারে না। পুলের আগের চড়াই উৎরাই-এর জন্য নাকি? সবজান্তা ঠিকেদার সাহেব বলে—"দেখি তোর গালের মাংস নাচে কি না; গলারগুলি নাচে? ও তোর কেবল হাত কাঁপার রোগ নয়। অনেক দেখেছি

ওরকম। বেশী মদ খেয়ে হয়েছে। এখনও ছাড়্, না হ'লে তোর বরাতে যে কি আছে, তা, বেশ জানি।"

"আচ্ছা চুপ করো ঠিকেদার, এই হাতেই এমন গাড়ী চালাবো, যা আজকালকার ছোকরারা কোনো কালে পারবে না। আজকালকার ছেলেপিলের আবার শিক্ষে, তার আবার কথা; মায়েরা পর্যন্ত ছোট ছেলেপিলেদের সাহেবকে দিয়ে ধরিয়ে দেবো বলে ভয় দেখায় না। এরা আদব কায়দা শিখবে কোথায়।"

উনত্রিশ মাইল পর্যন্ত ইট পোতার কাজ শেষ হইয়াছে। ট্রাক চালাইবার সময় সম্মুখে দেখা যায়, দূর দিগন্তে পথের লাল কালো এক হইয়া গিয়াছে। এদিককার কাজ শেষ হইল। এখান হইতে আর বেশী দূরের কাজ করা সম্ভব নয়। যাইতে হইবে আগের ক্যাম্পে —এখান হইতে উনিশ মাইল দূরে। আণ্টাবাংলার হাতা ছাড়িয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে।···দূর মরুকগে, ওখানে আর কি ছাই আছে! ঘরের ইট কখান পর্যন্ত খুলে নিয়ে গিয়েছে।—সত্যই ইটগুলি লইয়া আসিবার পর হইতে, তাহার যেন আর ঐ স্থানের জন্য মন তত উতলা হয় না। কেমন খালি খালি মনে হয়। বাবরুম গিয়াছে, তাহার শুইবার বেদী গিয়াছে, বোগনভিলির গাছ গিয়াছে,— ভাবিলেই মন উদাস হইয়া উঠে। কাপ্তান পুলের নীচের নদীটি কিন্তু সেই ছোটবেলার মতই আছে। কচুরিপানা বোধ হয় কিছু বাড়িয়াছে। তাহা হইলেও পাকুড়গাছের নীচে ছায়ায় দাঁড়াইয়া পুরানো কথা ভাবিতে বেশ লাগে। সে এদিক দিয়া ট্রাক লইয়া গেলেই এখানে একবার নামিয়া বিড়ি ধরাইয়া যায়। সেই রকমই সোঁদা গন্ধ নদীর ধারের, সেইরূপই গুলজর ধোপার স্ত্রী কাপড় কাচিতেছে। কালো পিচের পথকে লাল ইটে দুই দিক হইতে চাপিয়া ধরিয়াছে।···

মজুরেরা বলে, "চলো ডেরাইভার সাহেব।"

"এই আসি। তোরা বিড়ি খাবি, এই নে।"

আরও খানিকক্ষণ থাকিবার অবকাশ পাওয়া যায়।

আগের ক্যাম্পে যাওয়া আর কতদিন স্থগিত রাখা যায়। এক কেবল চাকরি ছাড়িলে হয়। কিন্তু তাহার পর।—আণ্টাবাংলা গিয়াছে, জসলীন সাহেব গিয়াছে, বয়স হইয়াছে, হাত-পা কাঁপে। এখন রোজগার না করিলে দাঁড়াইবে কোথায়। কসমপল্টন ক্লাবে; মরিয়া গেলেও নয়।

আরও দিনকয়েক এখানে থাকিবার সুযোগ ঘটিয়া গেল। এ বছরটিও বোটরা ঠাকুরদা'র কবরে ফুল দিবার দিনটি এখানে থাকিবার সুবিধা পাইয়া গেল। রাস্তার মাঝের পিচের অংশটির প্যাচ রিপেয়ার হইতেছিল। ম্যুনিসিপ্যালিটির আট টনী মোটর-এঞ্জিন-রোলার তাহার উপর চালাইতে হইবে। ম্যুনিসি-প্যালিটির একমাত্র ড্রাইভার ছুটিতে। ঠিকেদারের অনুরোধে বোটরা একাজ করিতে স্বীকার করে। সেন্ট্রাল পি, ডব্‌লু, ডি'র সাহেব তাহাকে কয়েক দিন এই কাজ করিবার জন্য ছুটি দেন। যে দুই দিন এখানে থাকিয়া লওয়া যায়। তাহার পর কোথায় ঠেলিবে কে জানে। যে আসাম হইতে তাহার বাবা ফেরে নাই, হয়ত সেখানেই দিন নাই রাত নাই, ট্রাক চালাইতে হইবে মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত। আণ্টাবাংলাই যখন ছাড়িতে হইল তখন আর দেশে ফিরিলেই বা কি, না ফিরিলেই বা কি? ভগবানকে ধন্যবাদ ঠাকুর্দার মৃত্যুর তারিখটি এবারেও সে এখানেই পাইয়া গেল।

ঠাকুর্দার কবরের উপর ফুলের তোড়া রাখিয়া সে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করে। এবার বোগনভিলির ফুল পায় নাই। ফাদার টুডু বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই কোন না কোন রকমে ঐ ফুল যোগাড়

করিতেন। আজ বোটরার দিনে উপোস। মদ, তাড়ি কিছুই ছুঁইবে না। রাতে ফিরিয়া খাইবে। সে কাজে বাহির হইয়া পড়ে।

ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে বৈশাখের রৌদ্র। নিজের রুক্ষ নগ্নতায় মধ্যে মধ্যে সচেতন হইয়া পাঁশুটে ধূলার আংরাখা দেহে টানিয়া লয়। দমকা পশ্চিমা বাতাসে রাশি রাশি ধূলা দিগন্ত পর্যন্ত ছুটিয়া চলিয়া যায়। পথের ডান ধারে কিছুদূরে একটি সাঁওতাল ছেলে বিড়ি ধরাইবার পর দিয়াশালাইএর কাঠিটি দিয়া শুক্‌নো ঘাসে আগুন ধরাইবার চেষ্টা করিতেছে। বোটরা মোটর-রোলারের ভিতর হইতে চ্যাঁচায় "হে ছোকরা, ঘাস বারুদের মত হ'য়ে আছে দেখছিস না?" ছেলেটি দৌড়িয়া পালায়। বোটরা মনে মনে হাসে। তাহারাও ছোটবেলায় প্রতিবার এই মাঠে আগুন ধরাইত। সব একই আছে—অথচ কিছুই সেইরূপ নাই। এই যে সাঁওতাল ছোকরা রামবাগের রাস্তার দিকে ছুটিয়া পালাইতেছে সেযুগে কি পারিত? কুকুরের ভয়ে ওমুখো হইত না···রোলারের ক্লীনারটির কালো চুলে ও ভ্রূর উপর ধূলা জমিয়া, তাহাকে বুড়ো বুড়ো দেখাইতেছে। চোখে নাকে মুখে অজস্র বালুকণা। দাঁতের মধ্যে বালু কর্‌কর্‌ করিতেছে। কোথা হইতে যে এত ধূলা আসে বুঝা যায় না। অনবরত পশ্চিম হইতে ধূলা আসিতেছে—সেখানকার ধূলা কি কোনো কালে শেষ হইবে না। গলা শুকাইয়া উঠে। বাতাস ধোঁয়া ও ধূলায় এত ভারী হইয়া উঠিয়াছে যে মধ্যে মধ্যে মনে হয় দম বন্ধ হইয়া আসিল। কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। মোটর আর ট্রাক চালানো অভ্যাস, রোলারের এই মন্থর গতি বড়ই একঘেয়ে লাগে। এঞ্জিনিয়ার সাহেবের আবার হুকুম, দেখো যেখানে যেখানে পিচের অংশের প্যাচ রিপেয়ার হ'চ্চে কেবল সেইটার উপর দিয়ে রোলার চালাবে। ইটের অংশের উপর ভুলেও নয়; রাস্তার পাকা অংশ অনেক উঁচু

দেখ্‌ছো না ; আট টনী রোলার খাড়া ইটের উপর দিয়ে গেলে, সেগুলি ছাতু হ'য়ে যাবে। আবার তাহ'লে নতুন ক'রে কাজ আরম্ভ ক'রতে হবে সেখানে। সাবধান, তাহ'লে সকলের চাকরি নিয়ে টানাটানি পর্যন্ত হ'তে পারে। বোটরা বোঝে এ কেবল তাহাকে ভয় দেখানো হইতেছে। ক্ষতি হইলে ঠিকেদারের হবে, অন্য লোকের কি, ডিপার্টমেণ্টেরই বা কি ? সে সব জানে···রোলার চালানো কিছুই কঠিন নয়। তবুও সে যেন ষ্টিয়ারিং ঠিক রাখিতে পারিতেছে না। রোলারের ষ্টিয়ারিং-এর সে ঠিক আন্দাজ পায় না।··· একবার সম্মুখে চালাও, আবার পিছনে চালাইয়া লইয়া আসিতে হইবে। অনবরত ব্যাক করিতে কি ভাল লাগে। সম্মুখে একখানা আয়না পর্যন্ত নাই, পিছনে জিনিস দেখিবার জন্য। সম্মুখের ধূলা হইতে বাঁচিবার জন্য কাঁচের পর্দাটি পর্যন্ত নাই। সম্মুখে চালাইবার সময় মনে হইতেছে খুব জোরে চালাইতেছে, কিন্তু পাশের লোক হাঁটিয়া ইহা অপেক্ষা দ্রুত চলিয়া যায়। বোটরা আড়চোখে তাহার মুখের দিকে একবার তাকাইয়া লয়—বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছে না তো ? এত আস্তে চলে যে মাছের কাঁটার মত করিয়া গাঁথা ইটের খাঁজগুলি পর্যন্ত দেখা যায়। ষ্টীয়ারিং সোজা রাখিতে পারিতেছে না। ক্লীনার রসিকতা করে "আজ তো মাল টানো নি। পেট্রোলের ট্যাঙ্কিতে ভুলে মাল ঢেলে দাওনি তো ভাইয়া ? এঞ্জিনের নেশা হয়েছে মনে হচ্ছে।" বোটরা এই রসিকতায় যোগ দিতে পারে না··· সম্মুখের লালবর্ডারযুক্ত কাল কার্পেট দিগন্ত পর্যন্ত তাহারই বিদায় উৎসবের জন্য পাতা হইয়াছে—লাটসাহেব আণ্টাবাংলায় আসিলে সেকালে যেমন পাতা হইত। আর কয়দিনের মধ্যে সে ঐ ধূলার পর্দা-ঢাকা দিগন্ত ছাড়াইয়া আরও কতদূরে চলিয়া যাইবে। নিজের খোঁড়া কবরের সিঁড়ির ধাপে-ধাপে, নিজের ট্রাকে করিয়া আনা ইটের

পথে, সে আগাইয়া চলিবে—'বোথারে'র রাজ্যে, বেলী সাহেবের চা বাগানের রাজ্যে, যাদুকরীদের স্বপ্নরাজ্যে। বর্ষায়—পোড়া ঘাসগুলির গোড়া হইতে আবার শ্যামল সতেজ ঘাস বাহির হইবে। কিন্তু সে তখন কোথায়! আজতো সে নেশা করে নাই। তবে এত বাজে কথা কেন মনে আসিতেছে। তাহার সর্বশরীর থর থর কাঁপিতেছে। সব পেশী ও শিরা দব্‌দব্‌ করিতেছে। কাপ্তেন পুলের রেলিং মনে হইতেছে, পলায়মান সাপের তীব্র বিসর্পিল গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। পাকুড়গাছের পাতা অজস্র সাপের জিভের ন্যায় লিক্‌লিক্ করিয়া কাঁপিতেছে। পিচগলানোর চুল্লীটিও সজীব হইয়া চোখের সম্মুখে নাচিতেছে। ঘোড়ায় চড়া বেলী সাহেব, চশমাপরা ফাদার টুড়ু, ঠাকুর্দা বিরসা, ছোট বেঞ্জামিন, মার্কার সাহেব, কেরানীবাবু, আণ্টা-বাংলার ভাঙা দেওয়াল, বোগনভিলির গাছ, অজস্র স্মৃতির প্রেতাত্মা তাহার ষ্টিয়ারিং হুইলের ভিতর দিয়া ঘূর্ণিবাত্যার মত চলিয়া যাইতেছে। অসংখ্য জোনাকির অস্থির দীপালী, স্বচ্ছনীল জ্যোৎস্নার রাজ্য পিছনে ফেলিয়া সে চলিয়াছে। পথের লাল-কালো, রৌদ্রের ঝলক, পাকুড়গাছের সবুজ, অসংখ্য জোনাকির ঝিকিমিকি, ঘুরপাক খাইয়া কেমন যেন সব জট পাকাইয়া যায়। ষ্টিয়ারিং হুইলের উপর তাহার মাথা ঢলিয়া পড়ে। ক্লীনার চীৎকার করে "সমহালকে ভাইয়া, মদ না খেয়ে ঢুলুনি আসছে নাকি? এই এই ঠিক করে ধর।" আট-টনি রোলার, মড়মড় করিয়া ইটের বর্ডার চূর্ণ করিয়া, সজোরে পথের ধারের পাকুড়গাছটিতে ধাক্কা দেয়। বোটরার স্পন্দনহীন দেহ ছিটকাইয়া পথের উপর পড়ে।

পশ্চিমা হাওয়ায় আণ্টাবাংলার ইটের গুঁড়া উড়িয়া দিগন্তে মিশিয়া যায়। সঙ্গে উড়াইয়া লইয়া যায় ইগুয়ানোডোনের যুগের মত এক যুগের স্মৃতির অবশেষ। রাখিয়া যায় তরাইয়ের নূতন জীবনের জয়-

যাত্রার রাজপথ—মস্থন কাল দেহে; নবপ্রসূতের রক্তলেখা। গত যুগের সাক্ষী পাকুড়গাছটির কাণ্ডের ক্ষত হইতে রস ঝরিয়া পড়ে, নূতন মাঙ্গলিক বসুধারার মত।

পীরুমল কণ্ট্রাক্টর গোনে "এক, দো, তিন, চার, পান, ছে, সাত, আট।—আটখানি ইট বদলাইয়া নূতন করিয়া গাঁথিতে হইবে।

পঙ্কতিলক

মাদ্রিদ ঐতিহাসিক মিউজিয়মের উপনিবেশ বিভাগে আছে একখানি পুরাতন চিঠি—আর তাহার সঙ্গেই রাখা আছে একটি কাঁচের পাত্রে একতাল বিবর্ণ, কাটদষ্ট জটপাকানো সুতা। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের চিঠি। দিয়োগো ফার্ণান্দেজ চিঠি লিখেছেন পেরুর কুজকো সহর থেকে, তাঁর বন্ধু পেড্রো গণজেলোর কাছে। ··

···মাসাধিক কাল হইতে তোমাকে চিঠি পাঠানোর সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। মহামহিম স্পেনসম্রাটের জন্য এই স্থান হইতে কিছু সোনা ও রূপা যাইতেছিল। সেই নৌকায় এই চিঠি পাঠাইতেছি। করদোবার মাঠে অধ্যয়ন করিবার সময়, পিজারোর ইঙ্কারাজ্য জয়ের কাহিনী, আমাদের মনে কি রোমাঞ্চ, কি চাঞ্চল্য আনিত, তাহা বোধ হয় তোমার মনে আছে। কয়েকজন মাত্র অশ্বারোহী লইয়া এক নাবিকের অশিক্ষিত জারজ সন্তান, কি করিয়া এক সুসংগঠিত সাম্রাজ্যকে পদানত করিল, তাহাই তখন ছিল আমাদের বিস্ময়ের বস্তু। ফাদার হার্ণান্দো আমাদের বুঝাইতেন, যে প্রভু যিশুর নামের মহিমাতেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। ইহার সমর্থনে তিনি নজীর দিতেন, যে শেষ ইংকারাজ আথা-উল্পাকে বীর পিজারো শেষ মুহূর্তে সুযোগ দিয়াছিলেন খৃষ্টান হইবার। তাঁহাকে আগুনে দগ্ধ করিয়া বধ করা হইবে ঠিকই

ছিল। পিজারো তাঁহার নিকট প্রস্তাব করেন যে যদি তিনি জীবনের শেষদিনে সূর্যপূজা ত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তাহা হইলে আগুনে পুড়িয়া মরিবার পরিবর্তে, তিনি ফাঁসিতে ঝুলিয়া মরিবার অধিকার পাইতে পারেন; ইংকারাজ মরেন খৃষ্টান হইয়া। ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করিবার পূর্বে তাঁহার হাতে দেওয়া হইয়াছিল পবিত্র বাইবেল গ্রন্থ। সূর্যমন্দিরের পাথর দিয়া গাঁথা হইয়াছিল সেন্ট ডোমিনিক গির্জার ভিত্তি। ফাদার হার্ণান্দোর এ যুক্তি আমাদের মনে বসিত না। তুমি পিজারোর অনুচরদের সাফল্যের কারণ দেখাইতে—ক্যাষ্টিলের গৌরবময় বৈজয়ন্তীর অনুপ্রেরণা আর সোনা রূপার প্রতি তাহাদের দুর্নিবার লোভ। সোনার ক্ষুধায় তাহারা ঐ দেশে কি কি করিয়াছিল, তাহা আমরা সকলেই জানিতাম। কিন্তু তোমার যুক্তিও আমার নিকট অবান্তর মনে হইত। আর আমার নিজের ধারণা ছিল যে আগ্নেয়াস্ত্রের বলেই পিজারো, এই অসম্ভবকে সম্ভব করিরাছিলেন; কিন্তু মনের মধ্যে প্রশ্ন উঠিত—কয়টিই বা ছিল বন্দুক? ইংকা সামন্তরা ঐ কয়টি বন্দুকের ভয়েই কি বিদেশীর বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল? মনে মনে অনুভব করিতাম যে এখানে ইতিহাসের একটি ফাঁকি কিম্বা ফাঁক আছে। তাহারা কেন রাজা আথাউল্লাকে প্রাণ খুলিয়া সাহায্য করে নাই, তাহার কারণ জানিতে পারিলাম দৈবাৎ—অপ্রত্যাশিত রূপে; এক মেষপালকের নিকট হইতে। কুজকো হইতে লিমার পথের ধারে একটি গ্রামে দেখা হয় ঐ মেষ-পালকের সহিত। সে একটি সেতুর উপর বসিয়া "কুইপাস" দেখিয়া করুণস্বরে গান গাহিতেছিল। "কুইপাস' কি তাহা জানো না বোধ হয়। ইংকারাজ্যে লিখিত ভাষা ছিল না। রং-বেরংএর সুতায় বিভিন্ন গ্রন্থি দিয়া তাহার বাণ্ডিল করা হয়। সুতরাং রং ও গ্রন্থি দেখিয়া কুইপাসবিদ্ লোকেরা ইহার ভাষা

পড়িতে পারে। ইংকারাজ্যের কাজ এই ভাষাতেই চলিত। তবে গত কয়েক বছরে ইহার প্রচলন কমিয়া গিয়াছে। মেষপালকটিকে গান করিতে অনুরোধ করায়, সে 'কুইপাস' দেখিয়া দেখিয়া গানের সুরে যে গল্পটি বলিয়াছিল তাহা নীচে দিলাম। গল্পে লিখিত য়ুক্কা পাহাড়ের মঠের উপর, এখন আমাদের দুর্গ। ইহার নীচের গুহাকক্ষে সত্যই গল্পে বর্ণিত অগ্নিশিখা বর্ত্তমান; জমাট গন্ধকের পর্ব্বতপ্রমাণ স্তূপও আছে। যে কুইপাসে নীচের কাহিনীটি গ্রথিত তাহাও পাঠাইতেছি; মেষপালকের নিকট হইতে কিনিয়াছিলাম।

কুজকো সহর; সোনার সহর; মানুষের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। এখান হইতে দিকে দিকে গিয়াছে গন্ধক পাথরের রাজপথ, ইংকারাজ্যের শিরা উপশিরার মত। শত সহস্র যোজন। সোরার কণায় ভরা চোখ ঝলসানো মরুভূমির ভিতর দিয়া, সবুজ পাহাড়ের উপর দিয়া, দম আটকানো অন্ধকার গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়া। সহরের পূর্বদিকের পাহাড়ের ফাঁক দিয়া দেখা যায়, দূরে তামার রঙের পর্ব্বতের সারি উঠিয়াছে আকাশের দিকে, থাকের পর থাক।

সহরের পূর্বদিকে, যেখানে পথটি গিয়াছে লতাগুল্মের বিনুনি করা সেতুর উপর দিয়া, সেখানে দাঁড়াইয়া আছে দুষ্ট ছেলের দল। আজ মকর-সংক্রান্তির উৎসব। দলে দলে লোক আসিতেছে কুজকো সহরের দিকে। বোঝার ভারে সেতুটি আপনা হইতেই কাঁপে। কোন গ্রাম্য বৃদ্ধা সেতুর উপর উঠিলেই ছেলেরা সেতুটি দুলাইয়া দোল খাইতে আরম্ভ করে। নীচে বহু নীচে, সংকীর্ণ স্রোতধারা সুতার ন্যায় দেখিতে লাগে, ভয়ে বৃদ্ধা চীৎকার করে। সেতুরক্ষক দূরে দাঁড়াইয়া হাসে—আজকের দিনে এই সকল বালকসুলভ দুষ্টামী মার্জ্জনীয়।

চারিদিক হইতে রাজধানীর দিকে আসিতেছে অগণ্য লোকের

দল। শাঁখের মুখের দাগগুলির মত ঘোরানো পথে পাহাড়ের গা বাহিয়া উঠিয়া আসিতেছে বোঝা পিঠে "লামা" ভেড়ার সারি—ঠিক উইএর সারির মত। সকলের মাথায় পাগড়ি, গায়ে "লামার" লোমের জামা। অনেকেই সঙ্গে আনিয়াছে নববধূকে, কুজকো সহর দেখাইতে। এখানে তাহারা জগতপিতা মার্তণ্ডদেবের মন্দিরে পূজা দিবে। মকর সংক্রান্তির এক সপ্তাহ পূর্বে, রাজ্যের প্রথানুযায়ী প্রতি মণ্ডলীর বয়স্থ কুমার কুমারীরা একত্র হয় এক এক নির্দিষ্ট স্থানে। স্থানীয় রাজ-কর্মচারী দুটি কম্পমান হাত মিলিত করিয়া দেন। চারিটী কুতূহলী অপরিচিত চোখের মিলন হয়। তাহার পর লামার পিঠে কুইনোয়া, আলু, ভুট্টা ও তামার পাত্রের বোঝা চাপাইয়া তাহারা বাহির হইয়া পড়ে মণ্ডলীর সদরের মন্দিরের দিকে। এখানে তাহারা জগৎপিতা সূর্যকে এবং তাঁহার ভগিনী জগন্মাতা চন্দ্রকে প্রণাম করিবে। প্রতি বৎসর সব ভূমি রাজা নিজে লইয়া প্রজাদের মধ্যে পুনর্বিতরণ করেন মকর-সংক্রান্তির পরের সপ্তাহে। কেবল নবদম্পতিরা নয়, আরও অনেকেই এই মকর সংক্রান্তির দিন সূর্যমন্দিরে আসিয়া আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া যায়—'আমি যেন একটু ভাল জমি পাই প্রভু। ক্ষার ভরা না হয়।' আবার পাশের চাঁদের মন্দিরে যাইয়া বলে—'অন্তঃসলিলা ঝরণাটার ধারের জমিটার কথা আমার পালা এলে রাজকর্মচারীর মনে পড়িয়ে দিও, মা। গত বছর ঠিক সময়ে সরকারী 'লামা' না পাওয়ায় সময় মত গুয়ানোর সার আনতে পারিনি ; এ বছর যেন তেমন না হয়। তাহলে তিনটী আনারস বলি দেবো আসছে বছর তোমার মন্দিরে।'

সূর্যের মন্দির ঠিক সহরের মাঝখানে। জগতের দুঃখে একদিন জগৎপিতা আর জগন্মাতা থাকিতে না পারিয়া স্বর্গ হইতে পাঠাইয়াছিলেন তাঁহাদের পুত্র-কন্যাকে। পুত্রের হাতে দিয়াছিলেন একটি সোনার ফাল। ফালটী এই কুজকোতে আসিয়াই মাটির ভিতর

ঢুকিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। সেই জায়গাটীতেই দাঁড়াইয়া আছে গগনচুম্বী সূর্যমন্দির। এই ভ্রাতা ভগিনীর দম্পতি হইতেই আরম্ভ হইল ইংকারাজদের রাজবংশ।

এই বংশের দিগ্বিজয়ী সম্রাট হুয়ানোকুপাক কুড়ি বৎসর পর রাজধানীতে ফিরিয়াছেন দিন কয়েক মাত্র আগে। সেই যে তিনি গিয়াছিলেন কুইটো রাজ্য জয় করিতে, তাহার পর আর এতদিন দেশে ফেরেন নাই। অম্লান ভাস্করের তাপহীন দীপ্তি সেখানে সারা বৎসর। এই চিরবসন্তের রাজ্য জয় করিবার পর মৃত রাজার কন্যাকে ছাড়িয়া আর আসিতে পারেন না। রাজ্যজয়ের চেয়ে যে চিত্তজয়ের উদ্দীপনা কম নয়, তাহা জীবনে এই প্রথমবার চিরজয়ী বীর অনুভব করিলেন। কুজকোর এবং ইংকারাজ্যের প্রতি প্রদেশের রাজধানীতে আছে রাজঅন্তঃপুর—যেখানে শত শত নারী সূর্যপুত্রের বিলাসের উপচার হইবার সৌভাগ্য অর্জন করিবার প্রতীক্ষায় থাকে,—দিনের পর দিন, সারা যৌবন। কিন্তু এ মদিরাক্ষীর নয়নে কি যে উন্মাদনা ছিল হুয়ানোকুপাক আর তাহা কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। কুইটোকুমারী নিজের দেশ ছাড়িয়া যাইতে রাজী নয়, তাই হুয়ানো-কুপাককে বিশ বৎসর একাদিক্রমে সেই খানেই থাকিয়া যাইতে হইল। প্রথমে খবর পাঠাইলেন যে নূতন রাজ্যের দুর্বিনীত প্রজাদের অবাধ্যতার শাস্তি দিবার জন্য থাকিয়া যাইতে হইতেছে। তাহার পর সংবাদ দেন যে এ রাজ্যে লোকে প্যাচাকমাকের পূজা করে; এ স্থান যখন পেরুর স্বর্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে তখন ইহার দিকে দিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, দেবাদিদেব আদিত্যের মন্দির। তাহার পর রাজধানীতে খবর আসে যে পেরুর ভূমি সংক্রান্ত নিয়ম নূতন রাজ্যে প্রচলিত করিতে আরও তিন বৎসর সময় লাগিবে।

কতদিন আর কথা চাপিয়া রাখা যায়। কুজকোতে শশীদুহিতা

রাজমহিষীর চোখের অশ্রু উপচাইয়া পড়ে। তিনি রাজপুরোহিতকে দিয়া কুইটোতে খবর পাঠান। রাজপুরোহিতদের আদেশ না পালন করার দুঃসাহস আজ পর্যন্ত কোন ইংকারাজেরই হয় নাই। তিনি কড়া আদেশই দিয়াছিলেন—"রাজধানীর কাজই সবচেয়ে বড়। তোমার বাবা উপাকাক্ষি চিলি জয় করে ফিরেছিলেন দু'বছরে। তুমি কুরিমেয়ো জয় করে ফিরেছিলে এক বছরে, ক্যাক্সামার্কা দেড় বছরে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কি তোমার কাজ করার ক্ষমতা কমে আসছে?" উত্তরে বার্তাবহ কুইপাসে সংবাদ লইয়া আসে—"যুবরাজ হুয়াস্কারের ত্রিশ বছর বয়স হয়েছে। তাঁর এখন থেকে রাজ্যের কাজকর্ম জেনে নেওয়া ভাল।" সংক্ষিপ্ত উত্তর। এ উপেক্ষা রাজমহিষীর বুকে শেলের মতো বেঁধে। কন্যার এত ব্যথা এত অপমান দেখিয়া, স্বর্গ হইতে চন্দ্রদেবী তাঁহাকে কোলে টানিয়া লন। রাজকুমারী ওলিয়া তখন সাত বছরের, যুবরাজের বয়স তখন বত্রিশ।

ইংকারাজ দেশে ফিরিয়াছেন কুড়ি বৎসর পর; কুইটো হইতে সঙ্গে আনিয়াছেন, উনিশ বৎসর বয়সের যুবক আথাউল্পাকে। আথাউল্পা তাঁহার ছেলে—কুইটোর রাজকুমারীর ছেলে। হুয়ানোকুপাকের মাথার চুল সাদা হইয়াছে, শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কুইটোর নেশা কাটিয়াছে, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সের সন্তানকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না বলিয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। এতদিন পর রাজধানীর সব জিনিসই নূতন নূতন লাগিতেছে। সহরের সেতুগুলি মেরামত করা হয়নি; রাজপুরোহিত বার্দ্ধক্যের ভারে ঝুঁকে পড়েছেন; রাজমহিষী কত অভিমান করেই না চলে গিয়েছেন; যুবরাজ হুয়াস্কারের চুলেও দেখছি পাক ধরেছে, এত বয়স হলো; সেই রাণীর কোল আলো করা এক বছরের ওলিয়া আজ হয়ত কত বড় হয়ে উঠেছে।...

ওলিয়া থাকেন সূর্যকুমারীদের মঠে। রাজধানীর উপকণ্ঠে মুকা পাহাড়, তাহারই উপর এই মঠ। রাজকন্যা আর সামন্তদের মেয়েরা বারো বৎসর বয়স হইতেই শিক্ষা দীক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য এই মঠে থাকেন। মঠের ভিতর রাজ-পুরোহিত ছাড়া অপর কোন পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। বাইশ বৎসর পূর্ণ হইলে মেয়েরা চলিয়া যায় বিবাহের জন্য। রাজার পছন্দমত কতকগুলি যান রাজ-অন্তঃপুরে; আর বাকি সকলকে রাজা সামন্ত পরিবারে বিবাহ ঠিক করিয়া দেন।

মকর সংক্রান্তির প্রত্যুষেই হয় রক্ত সূর্যের পূজা। নূতন সূর্য সবেমাত্র চাঁদের কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন। এ শুভ মুহূর্তে তাঁহার চরণে অঞ্জলি দিবার অধিকার, কেবল সূর্যকুমারীদেরই আছে। তারপর দ্বিপ্রহরে মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের পূজা করিবেন, ইংকারাজ। মন্দিরের সম্মুখের বিশাল উপবন লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের বিভিন্ন ধরণের বেশ-ভূষা, আচার ব্যবহার। এক একদিকে এক এক অঞ্চলের লোকেরা স্থান করিয়া লইয়াছে। সকলেরই সঙ্গে আছে, দেশের একমাত্র গৃহপালিত পশু "লামা" ভেড়া। রান্নাবাড়ীর হাঙ্গামা আজ কাহারও নাই—কাল রাত্রি হইতে আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস। কেবল ছোট ছেলেপিলেরা কান্নাকাটি আরম্ভ করিলে মায়েরা লামার পিঠের থলি হইতে বাহির করিয়া দিতেছে ভুট্টার খই।

"আনারস খাবো মা?"

"আবদার। সূর্যিঠাকুরের ভোগের জিনিস চাইতে লজ্জা করে না!"

"থাক থাক। আজ বচ্ছরকার দিনে আর মেরোনা, ছেলেমানুষ ব'লে ফেলেছে।"

বয়স্করা মধ্যে মধ্যে ক্যাকোর শুকনো পাতা চিবাইয়া চাঙ্গা

হইয়া লইতেছে। এই পবিত্র নেশার জিনিসে উপবাস ভঙ্গ হয় না। বহুলোক এখন হইতেই উঠিয়া বসিয়া আছে, সারি সারি চীরগাছের উপর। বহু ভাগ্যবান স্থান করিয়া লইয়াছে বিশাল মন্দির প্রাঙ্গনের চতুর্দিকের প্রাচীরের উপর। উঁচুতে না বসিতে পারিলে সামন্ত-পুত্রদের মল্লক্রীড়া দেখা যাইবে না। চব্বিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত ইহাদের সকলেরই রাজ-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে হয় সেনাপতির অধীনে। এই মকরসংক্রান্তির দিনই হয় ইহাদের শৌর্য ও বীর্যের পরীক্ষা। এইজন্য মন্দিরের সম্মুখের প্রাঙ্গনের খানিকটা স্থান ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছে, সোনার শিকল দিয়া। মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের পূজার পরই ইংকা-রাজের সম্মুখে হইবে এই পরীক্ষা। তাহার পর সামন্তরা দিবেন দেবতাকে অঞ্জলি। সামন্তরা চলিয়া গেলে, সাধারণ প্রজারা যাইতে পারিবে সূর্যের মন্দিরে। সূর্যাস্তের পূর্ব্বে কতটুকুই বা সময়। ভিড়ে কয়টি লোকই বা দেবাদিদেবের নিকট পৌঁছিয়া প্রণাম করিতে পারিবে। ভিড়ের মধ্যে পিষিয়া মরিবার পুণ্য অর্জন করিতে পারিবে উহা অপেক্ষাও কম লোক। অধিকাংশই কাল সকালে বাসী সূর্যের পূজা দিয়া তবে বাড়ী ফিরিবে।

সমুদ্রের শামুক লইয়া খেলা করিয়া, দূর দূরান্তরের লোকের আচার ব্যবহার দেখিয়া, পরিচিত অপরিচিতের সঙ্গে গল্পগুজব করিয়া ক্যাকোর পাতা চিবাইয়া, গান গাহিয়া, ঢাক ঢোল তামার শিঙা ও ঘন্টা বাজাইয়াও সময় আর কাটিতে চায় না।

"ছাখ, ঐ ছাখ।"

লক্ষ লক্ষ দৃষ্টি এক স্থির লক্ষ্যের উপর গিয়া পড়ে। রাজ-উদ্যানের অরুণ স্তম্ভের উপর রামধনু রংএর ইংকা বৈজয়ন্তী উড়িতেছে; এইবার ইংকারাজ সিংহদ্বার দিয়া বাহির হইবেন। সিংহদ্বারের নিকট হইতেই কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়া গিয়াছে। রৌপ্য তরবারি

কোষমুক্ত করিয়া আজকের পরীক্ষার্থী সামন্তপুত্ররা এই বিশৃঙ্খল ভিড় নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। এই কার্যে তৎপরতার উপর তাহাদের আজকের পরীক্ষার সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করিবে। গত এক মাস হইতে তাহাদের পরীক্ষা চলিতেছে—নির্জলা উপবাসের পরীক্ষা, খর মধ্যাহ্নে এক যোজন দৌড়াইবার প্রতিযোগিতা, গড়ের ধ্বজস্তম্ভ হইতে লতা ঝুলিয়া নামিবার পরীক্ষা, রাজপ্রাসাদের প্রাচীরের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িবার পরীক্ষা, আরও কত দুরূহ বিষয়ের পরীক্ষা লইয়াছেন, সেনাপতি আর চারজন সেনানায়ক মিলিয়া।

প্রহরী বিরাট তাম্র শুষিরে ঘোষণা করিল, ইংকারাজের যাত্রারম্ভের সংবাদ। সহস্র সহস্র কুতূহলী চক্ষু গিয়া পড়ে তোরণদ্বারের উপর। সূর্যপুত্রকে নিজ চোখে দেখিতে পাইবে, এত নিকট হইতে দেখিতে পাইবে, ইহার উদ্দীপনা শত শত প্রতীক্ষমান নাগরিককে একই মুহূর্তে বিহ্বল করিয়া দেয়। চারিদিক নিস্তব্ধ; সকলে নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়াছে।

সর্বপ্রথমে দেখা যায় সেনাপতিকে, হাতে সাতরঙা পতাকা। তাঁহার পিছনে নীল পশমের পোষাকপরা সামন্তর দল কাঁধে করিয়া লইয়া আসিতেছে রাজার ডুলি। ডুলিটির পিছনের দিকটি একটি স্বর্ণ-নির্মিত জাগুয়ারের আকৃতির। অজস্র মরকত দ্বারা চিহ্নিত জাগুয়ারটির দেহ; চোখের উপর দুইটি বড় বড় বৈদূর্য বসানো। ডুলিতে বসিয়া আছেন হুয়ানোকুপাক ও হুয়াস্কার—রাজা আর যুবরাজ; পরিধানে সোনার রঙের বেশ—ভিকিউনা ভেড়ার নরম লোম দিয়া তৈরী। মাথায় সাতরঙা উষ্ণীষ—সূর্য আর চাঁদের মধ্যের রামধনুর সেতুর প্রতীক। উহা হইতে ঝুলিতেছে রক্তের মত লাল পশম দিয়ে বোনা একটি চক্র, ইংকারাজের ললাটে—ইংকারাজের রাজচিহ্ন। যুবরাজের কপালের চক্র পীত রঙের। রাজার শিরস্ত্রাণের উপর

গোঁজা আছে কোরাকাংক পাখীর দুটি পাখা, তাহা দেখিতে পাওয়াও ভাগ্যের কথা। রাজ্যের সকলেই জানে যে তাম্র পর্বতের তুহীন রাজ্য যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে পাওয়া যায় এই পাখী। দু'টিমাত্র এই পাখী একসঙ্গে জীবিত থাকে, ইংকারাজের মাথায় পালক যোগানোর জন্য।

জনতা ক্ষণ বিহ্বলতার সম্মোহন কাটাইয়া ওঠে। লক্ষ লক্ষ জীবনের যোগসূত্র সূর্যপুত্রকে চোখের সম্মুখে দেখিয়া কেহ আর নিজেকে সংযত রাখিতে পারে না। উৎসাহের আতিশয্য উচ্ছলিত হইয়া পড়ে স্বতঃস্ফূর্ত জয়ধ্বনির ভিতর দিয়া। যে ভাগ্যবান সামন্তরা ইংকারাজের ডুলিবাহকের কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতি ঈর্ষায় মন ভরিয়া যায়, শত সহস্র প্রজার। অধিকার নাই তবু সকলের মন চায়—যদি কোন রকমে ইংকারাজের পদস্পর্শ করিতে পারা যায় অন্ততঃ পক্ষে তাঁহার ডুলিটি। কিন্তু যাহাদের নীল পোষাক পরিবার অধিকার নাই, কানে স্বর্ণকুণ্ডল দিবার অধিকার নাই, তাহারা যদি ইংকারাজকে স্পর্শ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহাদের হইবে প্রাণদণ্ড। মার্তণ্ডদেবের তৈরী করা এ বিধান যুগ যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে; আজকের মত পুণ্যতিথিতে ইহার বিরুদ্ধে কিছু ভাবাও পাপ।

সূর্যপুত্র এই জয়োল্লাসের উত্তরে হাত তুলিয়া তাঁহার সন্তানদের আশীর্ব্বাদ করেন। স্মিতহাস্যে ওষ্ঠপার্শ্বের জরারেখাগুলি আরও গভীর হইয়া ওঠে। উদাস মুখটি এক স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় ভরিয়া যায়।...

প্রজাদের মনোভাবের তা'হলে এই কুড়ি বছরে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি; ইংকা সামন্তদের সাহস এই ক'বছরের মধ্যে কিন্তু অনেক বেড়েছে, না হ'লে কি তারা এই কিছুক্ষণ আগে আথাউল্লাকে রাজশিবিকায় আনতে অস্বীকার ক'রতে পারে! তারা পরিষ্কার মুখের উপর বলে দিল যে চন্দ্রসূর্যের সন্তান ছাড়া আর কাউকে কাঁধে করা

সূর্যবিধানের অবমাননা করা মাত্র। কুইটোকুমারের ওপর এত বিদ্বেষ!...

হুয়ানোকুপাক মনে করিয়াছিলেন যে এই উৎসবের অবসরে, তাঁহার অতি আদরের সন্তান আথাউল্লাকে, পদোচিত মর্যাদা দিয়া, তাঁহাকে জনসাধারণের সহিত পরিচিত করিয়া দিবেন। সামন্তদের অহেতুক বিরোধিতায় তাঁহার অন্তর ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে।

সূর্যপুত্রের উদাস মুখ দেখিয়া প্রজারাও চিন্তিত হয়, ...আহা দুদিন থেকে উপোষ চলছে। সকলে রাজা আর যুবরাজের উদ্দেশে প্রণাম করে...অনেক দূরে পিছনের ডুলিতে কে উনি?...সহস্র কুতূহলী চোখ সেই দিকে গিয়া পড়ে।...দেবতার মত রূপ, সুন্দর সুঠাম দেহ। ডুলিবাহকদের বেশভূষা দেখে কুইটো দেশের লোক বলে মনে হয়। এই কি কুইটোর সেই কুহকিনীর ছেলে? এরই মা কি সূর্যপুত্রকে যাদু করেছিল!...

জনতা মনের আবেগ সংযত করিয়া লয়। এই নীরব উপেক্ষায় আথাউল্লার শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠে। জনসাধারণের তাঁহার প্রতি এতটা ঔদাসীন্যের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। এমন জানিলে হয়ত তিনি পিতার সহিত রাজধানীতে আসিতেন না।

কয়েকশত দুর্বিনীত কুইটোর অধিবাসী, যাহাদের ইংকারাজ্যের নীতি অনুযায়ী, কুইটো হইতে সরাইয়া রাজধানীতে আনিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাদের মধ্য হইতে কুইটোর ভাষায় জয়ধ্বনি ওঠে। এই বিশাল জন-সমুদ্রের মধ্যে সে স্বর ক্ষীণ মনে হইলেও তাহা মুছিয়া দেয় আথাউল্লার মন হইতে ক্ষণিকের গ্লানি;—তা হ'লে এখানেও দেশের লোক আছে; কুইটোর মার্জিত রুচি লোকদের তুলনায় রাজধানীর লোকেরা বর্বর,—এরা তরবারির ভাষাই বোঝে, সময় এলে সেই ভাষাতেই এদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।...

শোভাযাত্রা সূর্যমন্দিরে পৌঁছায়। সমবেত জনতাকে আর মানুষ বলিয়া বুঝিবার উপায় নাই,—অগণিত ঘন সন্নিবিষ্ট নরমুণ্ড যেন চাপ বাঁধিয়া জমিয়া গিয়াছে। অসংখ্য কণ্ঠের সমবেত জয়ধ্বনি, নানাপ্রকার উৎকট বাদ্যযন্ত্রের নির্ঘোষ, গন্ধক, সিন্ধুশকুনের পুরীষ ও অ্যাণ্ডিসের চীড়ের আটা মিলাইয়া তৈরী একপ্রকার ধূপের ধোঁয়া, সব মিলিয়া মন্দির প্রাঙ্গনে এক অভিনব আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। ইংকাসামন্তরা দুইটি রূপার মোটা শৃঙ্খল ধরিয়া রহিয়াছেন, ভিড়ের মধ্যে রাজার ডুলির পথ করিয়া দিবার জন্য। ইংকারাজের মন তখনও বিরক্তিতে ভরা ;—সামন্তদের অবাধ্যতার কোন প্রতিকারই কি নেই ? কিন্তু তারা সূর্যবিধানের নির্দেশের বিরুদ্ধে তো সত্যিই কিছু বলেনি ; রাজার ডুলি কাঁধে নিয়ে আসবার সময় কোনো সামন্তের পদক্ষেপ ভুল হলে, তার প্রাণদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে ; সে ভুল তো কেউ করেনি ; আমার প্রতি কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় তারা ত্রুটিহীন, তবে তাদের দোষ দিই কেমন করে···

হঠাৎ হুয়ানোকুপাকের শ্যেনের মত প্রখর দৃষ্টিতে কোমলতার আভাষ লাগে। তাঁহার উদগ্র কৌতূহল ভরা দৃষ্টি গিয়া পড়ে মন্দিরের অলিন্দে। মন্দিরের সিঁড়ি দিয়া রাজার স্তুতিগীত গাহিতে গাহিতে নামিয়া আসিতেছেন, সূর্যকুমারীর দল, পরিধানে সাদা আলপাকার বেশ। তাঁহাদের মধ্যে কেবল একজনের বসন পীত আলপাকার। তিনিই রাজদুহিতা, যুবরাজের ভাবী স্ত্রী।

হুয়ানোকুপাক উদগ্রীব হইয়া চাহিয়া থাকেন ;—সেই ছোট্টো মেয়েকে দেখে গিয়েছিলাম বিশ বছর আগে। রাজমহিষীর কোল থেকে, দুধমা মেয়েকে নিয়ে, তাঁর কোলে দিল ; ঐ একরত্তি মাংসের দলাকে কোলে নিতে কেমন ভয় ভয় করছিল ; তাঁর কাছে এসেই মেয়েটি কাঁদতে লাগলো ; রাজকুমার হুয়াস্কার কোলে নিয়ে আদর

করতে তবে মেয়ের কান্না থামে; ওর মা তখন দূরে বসে মুখ টিপে টিপে হাসছে···

রাজমহিষীর কথা ইংকারাজের মনে পড়ে। তাঁহার উপর সুবিচার না করার অনুশোচনায় ইংকারাজের চোখের কোন আর্দ্র হইয়া উঠে। ভয় হয় হুয়াস্কার আবার সম্মুখের আসন হইতে তাঁহারই মুখের দিকে তাকাইয়া নাইতো। আড়চোখে সেদিকে তাকাইতেই নজরে পড়ে যে হুয়াস্কারের উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিও ঐ পীতবেশা ওলিয়ার উপরেই নিবদ্ধ।

প্রসন্নতার দীপ্তিতে ইংকারাজের মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে;···অন্য সূর্যকুমারীদের দিকেও তো হুয়াস্কারের কামনাবুভুক্ষু দৃষ্টি থাকতে পারতো; যুবরাজের পক্ষে তাতে অশোভনতাও কিছু নেই; প্রতি মকর সংক্রান্তির পর সূর্যকুমারীদের মধ্যের শ্রেষ্ঠ রূপসীর স্থান হয়ে এসেছে রাজঅন্তঃপুরে; যুবরাজ ওলিয়ার দিকে দেখছে ঠিক, কিন্তু সে দৃষ্টিতে উত্তাপ কই, তাতে যেন বাৎসল্যের কোমলতার আভাস, হুয়াস্কারের চুলে পাক ধরেছে বটে, কিন্তু ঐ বয়স যখন আমার তখন কুইটোর রাজকন্যার রূপ কি আমার চোখে নেশা লাগায়নি; আজকালকার ছেলেদের সবই সৃষ্টিছাড়া···

সূর্যকুমারীদের পুরোভাগে বৃদ্ধা মঠমাতা। তিনি আর রাজকুমারী ওলিয়া সুবর্ণ ভৃঙ্গার থেকে টিটিকাকার পূতবারি ছিটাইয়া দিতেছেন ইংকারাজের মন্দির যাইবার পথে। আলপাকার বেশগুলি সূর্যের আলোতে ঝলমল করিতেছে। মন্দির প্রাঙ্গনে সোনা ও রূপা দিয়া তৈরী নানা প্রকারের গাছ; রূপার আনারস গাছে সোনার আনারস ফলিয়া রহিয়াছে, রূপার ভুট্টা গাছে সোনার ভুট্টা ধরিয়াছে। মন্দিরের দেওয়াল, আলিসা, বারান্দা, সিঁড়ি চকচকে পালিশ করা সোনা দিয়া বাঁধানো। উহার উপর সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হওয়ায় সেদিকে তাকানো যায় না।

রাজা শিবিকা হইতে নামিলেন, মন্দিরের সিঁড়ির উপর। টিটিকাকার জল দিয়া ওলিয়া রাজা ও যুবরাজের পা ধোয়াইয়া দেন। জলাকর্ষী শৈবাল দিয়া তাঁহাদের পা মুছাইবার পর, পাকা ক্যাক্‌টাসের ফল দিয়া তাঁহাদের কপালে আঁকিয়া দেন সূর্য, চন্দ্র আর রামধনুর চিত্র। অপরিচিত পিতার মুখের দিকে ভাল করিয়া তাকাইতে পারেন না। তাকাইলে দেখিতে পাইতেন যে, যে হুয়ানোকুপাকের বীরত্বের গাথা লোকের মুখে মুখে, তাঁহারই স্নেহপ্রবণ চোখ দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে শিশুর অসহায়তা। আর যুবরাজ—তাঁহার সহিত দেখা এক বৎসর পর। তিনি চিলিতে গিয়াছিলেন রাজকার্যে। তাঁহার সৌম্যবদনে প্রশান্তির দ্যোতনা। ওলিয়ার মনে হয়, যুবরাজের হাবভাবে একটু নিরাসক্তির ব্যঞ্জনা তিনি যেন কয়েক বৎসর হইতেই লক্ষ্য করিতেছেন। …ছোটবেলায় যে দাদার কোলে পিঠে চড়েছি, এ কি সেই মানুষ? না বোধ হয় আমার মনের ভুল। সূর্যমন্দিরে মকরসংক্রান্তির পুজো করতে এসে যুবরাজ অন্যভাব দেখালে প্রজাদের কাছে লঘু হয়ে যাবেন না! রাজকার্য বড় কঠিন, দশদিক ভেবে কাজ করতে হয়। এক ভুল পদক্ষেপের ফলে সূর্যদেব অসন্তুষ্ট হ'য়ে উঠতে পারেন, রাজ্য ছারখার হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তবুও এতটা নির্লিপ্ত ভাব দেখানো কি সত্যিই দরকার।…

ওলিয়া ভাবিয়া কূলকিনারা পায়না। অকারণ সঙ্কোচের শৈত্যে, যুবরাজের ললাটে চিত্রাঙ্কনের সময়, তার কম্পমান আঙ্গুলগুলি আড়ষ্ট হইয়া আসে।

সূর্যকুমারীরা দুই সারিতে দাঁড়ান। কাহারও হাতে পালকের ব্যজনা, কাহারও হাতে ধূপদানি, অনেকের হাতে বাদ্য যন্ত্র, কেহ বা লইয়াছেন সোনার থলিতে অর্ঘসম্ভার। সকলে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন; ভক্তিভরে দৃষ্টি আনত। হুয়ানোকুপাকের ললাটের

বলিরেখা, সূর্যমন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিবার সময়, আরও কুঞ্চিত হইয়া উঠে।

······আথাউল্লাকে সামন্তরা কোথায় স্থান দিয়েছে বসবার; সে ছেলে বড় অভিমানী, নিজের দেশে আমার পক্ষপুটে থেকে, কোনদিন রাজপরিবারের মধ্যে এ বৈষম্য সে তো দেখেনি; এ তাচ্ছিল্য তার বুকে বাজবে। তার বোন ওলিয়ার সঙ্গে তার দেখা করিয়ে দিতে হবে; সামন্তপুত্রদের মল্লপ্রতিযোগিতার সময় সামন্তরা আবার সে সুযোগ দিলে হয়। একমাত্র সুখের কথা হুয়াস্কার আথাউল্লাকে ভাই বলে গ্রহণ করেছে। ছোটবেলা থেকেই যুবরাজ স্নেহশীল ও উদারপ্রকৃতির লোক। বোঝে সব, কিন্তু শান্ত, ধীর। সে আথাউল্লাকে নিজের মহলেই স্থান দিয়েছে। এই ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্য যদি আথাউল্লা বজায় রাখতে পারে, তবেই আমি শান্তিতে মরতে পারি···

মন্দিরের ভিতরের সুউচ্চ দেওয়ালটি জুড়িয়া বিরাজ করিতেছেন সোনার মার্তণ্ডদেব। বিরাট স্বর্ণ-বৃত্তটীর উপর অঙ্কিত আছে একটি চক্ষু—সন্তানদের উপর নিরবচ্ছিন্ন দৃষ্টির প্রতীক। পরিধির নিকট হইতে দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে সোনার রশ্মিজাল। ধূমায়মান ধূপের চক্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া, বৃদ্ধরাজপুরোহিত। তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মঠমাতার দিকে তাকান। মঠমাতা উত্তর দেন যে এখন আর তরুণস্তম্ভের নীচে ছায়ার কলুষ নাই; মধ্যাহ্নে মার্তণ্ডের পূজার শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্ত সমাগত। সকলে নতজানু হইয়া বসেন; ধূপচক্রে আরও কিছু ধূপ ছড়াইয়া দিয়া, রাজপুরোহিত উদাত্ত কণ্ঠে সূর্যের মন্ত্রোচ্চারণ করেন। হুয়ানোকুপাক ঐ মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি করেন।

"পরমপিতা মার্ত্তণ্ডদেব! তোমায় আমার নতি জানাই। তোমার দৃষ্টি হইতে বিচ্ছুরিত হয় প্রচণ্ড তেজ, কোটি কোটি অগ্নিগর্ভ কোটা-প্যাক্সির জ্বালামুখ হইতে উদ্গারিত অঙ্গারের মত। তাই দিয়া নিঃশেষ

করিয়া দাহন কর আমাদের দেহের যত পঙ্কিলতা। হে রুদ্র ভাস্কর! লক্ষ অ্যাটাকামার রুক্ষ প্রচণ্ডতা তোমার দীপ্তিতে। তাহারই পূত স্পর্শে অস্ত হোক ইংকাদের এই স্বর্গরাজ্যের সকল পাপ ও মলিনতা। তুমি বজ্রের মত কঠোর, আবার ভিকিউনার পশমের চেয়েও কোমল। আমাদের দুঃখে যখন তুমি ব্যথিত হও, তখন তোমার চক্ষু দিয়া সোনা হইয়া ঝরিয়া পড়ে অশ্রুধারা এই পৃথিবীর উপর। তোমার অমোঘ বিধান অনুযায়ী আগামী বৎসরও আমি দেশের ভূমির এক-তৃতীয়াংশ তোমার সেবায় নিয়োজিত করিব, এক-তৃতীয়াংশ রাজকার্যে ব্যয়ের জন্য রাখিব, এবং এক-তৃতীয়াংশ আমার সন্তানতুল্য প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিব। হে বিবস্বন! আমাদের উপর সদয় থাকিও।”

তাহার পর রাজপুরোহিত তাঁহাদিগকে পাশের মন্দিরে লইয়া যান। এইখানে দেওয়াল জুড়িয়া আছে চন্দ্রমার রৌপ্যমূর্তি। পূজার উপচার, বিগ্রহের আকৃতি প্রভৃতি এ ঘরের প্রতি জিনিসই সূর্যমন্দিরেরই অনুরূপ —কেবল এখানে সোনার পরিবর্তে সকল দ্রব্যই রূপা দিয়া তৈরী।

পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ আরম্ভ করেন।

“জগন্মাতা চন্দ্রমা! প্রভাকরের ভগিনী ও সহধর্মিণী তুমি। আমাদের প্রণতি গ্রহণ কর। তোমার মধুর পরশে রূপে, রঙে, রসে পূর্ণ হইয়া উঠে আমাদের এই পৃথিবী; তামার বরণ অ্যাণ্ডিসের কোল ঢাকিয়া যায় ভুট্টা ক্ষেতের শ্যামলিমার আবরণে। অ্যাটাকামার রুক্ষবুকে ফুটাইয়া তোলো ক্যাকৃটাসের ফুল। তোমার স্নিগ্ধ স্পর্শ শীতল করিয়া দেয়, ক্ষারভরা মাটির ঊষর বুকের দহন জ্বালা; শিহরণ লাগে সাগর-তীরের উদ্ধত নারিকেলের সারিতে। তোমার পতি যখন সুদূর অ্যাণ্ডিসের বৃদ্ধ চিম্বারেজোর সাদা মাথায় অগ্নিবৃষ্টি করেন, তখন এদিককার নদীনির্ঝরে উচ্ছলিত হয় তোমার আশীর্বাদ; সিঞ্চিত হইয়া উঠে পেরুর স্বর্গরাজ্য তোমার পীযূষধারায়। আমাদের দুঃখে মা

তুমি যখন ক্রন্দন করো তখন ঝরিয়া পড়ে পৃথিবীতে রৌপ্যের অশ্রুধারা। কোমল হস্তে মুছাইয়া দাও আমাদের মনের যত মালিন্য ও আবিলতা। ভাস্বতি! আশীর্বাদ কর অধম সন্তানকে!"

সামন্তপুত্রদের পরীক্ষা ও সমাবর্তন উৎসব আরম্ভ হয়। বিধুনিত হইয়া উঠে আকাশ বাতাস লক্ষ লক্ষ উৎসবমত্তের উচ্চ কণ্ঠরবে। ইংকারাজের মার্তণ্ডপূজার পর উৎসবের আরম্ভ। পূজার পূর্ব পর্যন্ত লোকে রাখিয়াছিল এক কৃত্রিম গাম্ভীর্যের মুখোস। এখন আর সে গাম্ভীর্যের প্রয়োজন নাই। লঘু পদক্ষেপে, নৃত্যের ছন্দে, বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসেন সূর্যকুমারীর দল। দলের সর্বাগ্রে সূর্যের মত দীপ্তিময়ী ওলিয়া। তাঁহাদের মুখে গত চতুর্দশ ইংকা সম্রাটের বন্দনা গান। অধিকাংশের হাতে বিভিন্ন আকারের স্বর্ণপাত্র। তাহাতে রাজপুরোহিত ভরিয়া দিয়াছেন, দেবতাকে উৎসর্গীকৃত চিচা—সূর্যের শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য—ভুট্টা হইতে নিষ্কাশিত একপ্রকার উগ্র সুরা। মন্দিরের উপবনের পথে ঐ একই সময়ে বাহির হইয়া আসেন রাজপুরোহিত, রাজা ও যুবরাজ। তাঁহারা নিজ নিজ নির্দিষ্ট আসনে বসেন।

হুয়ানোকুপাক ভাবেন...আথাউল্লা গেল কোথায়। এখন উৎসবের সময়, এখন আর সামন্তদের আপত্তি থাকার কোন অর্থ হয় না; না যুবরাজের পাশেই একখান অতিরিক্ত আসন দিয়েছে দেখছি···

মঠমাতা বলেন "মহারাজ একে চিনতে পারছেন?"

সম্মুখে 'চিচা'র পাত্র নিয়ে ওলিয়া।

"ওলিয়া!"···তাঁর মেয়ে; ইংকারাজের একমাত্র মেয়ে, ভবিষ্যতের ইংকারাণী, ভাবী যুবরাজমহিষী; কারও অনুকম্পায় তার এ পদ-মর্যাদা নয়; সূর্যবিধানের অমোঘ নির্দেশে তার এই অধিকার;

রাজ্য জোড়া কোটি কোটি সন্তানের সে মা; রাজ্যের মঙ্গল মাধুরীর উৎসমুখ; সূর্যচন্দ্রবংশের নিষ্কলুষ রক্তের পারম্পর্য রক্ষার সেতুপথ; এই স্বর্গরাজ্যের দীপ্তিময় ঐতিহ্য ও গৌরবময় ভবিষ্যতের সংযোগসূত্র..."ওলিয়া!"...কেবল আথাউল্লার কথা মনে আসছিল। এর কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।

হুয়ানোকুপাক নিজের মনের কাছে নিজেই যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া যান।

ওলিয়া সলজ্জ হাসিয়া ভৃঙ্গার হইতে 'চিচা' ঢালিয়া দেন; এ পুত পানীয় সর্বপ্রথম পান করিবেন ইংকারাজ, তারপর যুবরাজ, তাহারপর ইংকা সামন্তরা। এতদিনের অদর্শনের পর কন্যার সহিত কি কথা বলিয়া আরম্ভ করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া, হুয়ানোকুপাক পাশের আসন ওলিয়াকে দেখাইয়া দেন।

"ব'সো"

"এখনি আসছি, দাদাকে 'চিচা' দিয়ে"

যুবরাজও এতক্ষণ ওলিয়াকেই লক্ষ্য করিতেছিলেন;—যোদ্ধা পিতা আবার নিজের অজ্ঞাতে ওলিয়ার সংবেদনশীল ও স্পর্শকাতর মনে কোনরূপ আঘাত না দিয়া ফেলেন,...ওলিয়ার মুখটি দেখিলেই মায়া লাগে; বোধ হয় ছোটবেলা থেকেই মা নেই বলে...

ওলিয়া 'চিচা'র পাত্র লইয়া সম্মুখে আসেন।

"উপোসের পর বেশী খেয়োনা, সামান্য নাও; তোমার আবার সুরাপানের অভ্যাস নেই।"

স্বর্ণনির্মিত একটী ছোট ভেড়ার শিঙের মত পাত্রে যুবরাজ 'চিচা' গ্রহণ করেন।

অগণিত প্রজামণ্ডলী লক্ষ্য করিতেছে ওলিয়ার গতিবিধি, প্রতিটী অঙ্গভঙ্গী। তাহারা এত দূরে আছে যে তাহারা মুখ চোখ কিছুই

দেখিতে পাইতেছেনা; তবে সকলেই জানে যে পীতবসনা সূর্য-কুমারীই রাজদুহিতা, ভাবী ইংকারাণী; স্ত্রীজাতির সকল গুণের মূর্ত্ত প্রতীক, সতীলক্ষ্মী চন্দ্রদেবীর মর্ত্ত্যের কায়া। দর্শকদের মধ্য হইতে মেয়েরা ওলিয়ার উদ্দেশে প্রণাম জানায়।

ছোট ছেলেমেয়েরা মায়েদের জিজ্ঞাসা করে "ঠিক চাঁদের মত দেখতে; না মা?"

"প্রণাম করেছিস?"

অন্য দর্শকেরাও দেবী ওলিয়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। গতবছর হুয়াস্কার যখন রাজকার্যে চিলিতে গিয়াছিলেন, তখন এদিকে হইয়াছিল ভীষণ অন্নকষ্ট।...তখন ওঁর প্রাণ সন্তানদের দুঃখে কেঁদেছিল। তিনি রাজপুরোহিতকে ব'লে রাজভাণ্ডার আর সূর্য-ভাণ্ডারের সব ভুট্টা প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দেবার আদেশ দিয়েছিলেন। একুশ বছর বয়স হ'লো। আর এক বছর পরেই তো বিয়ে হবে। তারপর আমরা সতীলক্ষ্মী রূপে দেবীকে দেখিতে পাব। তখন আর সূর্যকুমারীদের মঠের ভিতর ওঁকে বন্ধ থাকতে হবেনা...

ওলিয়া 'চিচা'র ভৃঙ্গার মঠমাতার হাতে দেন—ইংকা সামন্তদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য। তারপর পিতার আসনের দিকে যান... একি! পিতার আসনের দক্ষিণে তাঁর জন্য রাখা আসনে এক যুবক বসে রয়েছেন, দেবতার মত রূপ, গর্ব্বোন্নত শির, প্রতিভার ছাপ চোখে মুখে; বীরত্ব ও মার্জিত রুচির ব্যঞ্জনা প্রতি অঙ্গভঙ্গীতে। তুষেজের সমুদ্রের মত কালো চঞ্চল দৃষ্টি তাঁর, কিন্তু সে দৃষ্টির স্পর্শ হিমশীতল নয়, তাতে উষ্ণতা আছে, মাদকতা আছে। এমন তো কোন দিন দেখিনি...

ওলিয়া যাইতেই সেনাপতি ব্যস্ত হইয়া দূর হইতে নিজের আসনখানি রাজার পার্শ্বে আনিয়া রাখেন, রাজকুমারীর বসিবার জন্য।

ইংকাসামন্তদের মুখমণ্ডলে প্রকাশ পায় আথাউল্লার: প্রতি বিরক্তির চিহ্ন, রীতিবিরুদ্ধভাবে রাজকুমারীর আসন দখল করার জন্য।

হুয়ানোকুপাকই প্রথমে কথা বলেন। “আমিই একে তোমার আসনে বসতে বলেছি। এ কুইটোর কুমার আথাউল্লা, তোমার ভাই; নতুন এসেছে এ দেশে। কতক্ষণ একা একা থাকবে, তাই আমি একে এখানে বসতে বলেছি। এর সঙ্গে আলাপ করো।”

ওলিয়া জীবনে এই প্রথম পিতার সান্নিধ্য পাইয়াছে। কত কথা বলিবার ছিল; কিন্তু এখন কিছুই মনে পড়েনা। কথা বলিতে একটু ভয় ভয়ও করে। পিতাও অপরিচিত, আথাউল্লাও অপরিচিত। তবু আথাউল্লার প্রথম সহাস্য অভিবাদন, সব সঙ্কোচ দূর করিয়া একেবারে আপন করিয়া লয়।

সোনার শিকল দিয়া ঘেরা মল্লভূমিতে সামন্তপুত্ররা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, সেনাপতি আর চারজন সেনা-নায়ক—তাহাদের পরীক্ষকের দল।

প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল। রণবাদ্যের তাল তালে পা ফেলিয়া, বিদ্যার্থীরা প্রতিটী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিল। ভুল পদক্ষেপ পরীক্ষার্থীর পক্ষে মারাত্মক ত্রুটি বলিয়া বিবেচিত হয়। বহুদূরে ঝুলানো সারি সারি কলা তীর দিয়া দ্বিখণ্ডিত করা, টিন মিশানো তামার তরবারি দিয়া শুকানো নারিকেল দ্বিখণ্ডিত করা, অসিযুদ্ধ, আরও কত রকমের ব্যায়াম-নৈপুণ্যের প্রতিযোগিতা হয়।

মহারাজ ও যুবরাজ দেখিতেছেন বিদ্যার্থীদের মধ্য হইতে কাহাকে রাজ্যের কোন কাজে নিযুক্ত করিলে, সে দক্ষতার সহিত সেই কাজ করিতে পারিবে। প্রজারা না বুঝিলেও সামন্তপুত্ররা সকলেই জানে যে এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্যই তাই। সৈন্যবিভাগ, গুপ্তচর বিভাগ,

ভূমিবণ্টন বিভাগ, মন্দির বিভাগ, পথ সংস্করণ বিভাগ, মেষ বিভাগ, স্বর্ণ রৌপ্য বিভাগ, রাজভাণ্ডার, কত কাজের জন্য কত নূতন নূতন সামন্তপুত্রের দরকার হয় প্রতি বৎসর। এই সকল বিশ্বাসের কাজ সামন্ত পরিবারের বাহিরের লোককে দেওয়া, সূর্যবিধানের নির্দেশের বহির্ভূত।

সূর্যকুমারীরা নিজেদের পদমর্যাদার কথা বিস্মৃত হইয়া বিভিন্ন প্রতিযোগীর রূপ গুণ লইয়া অনুচ্চস্বরে আলোচনা করিতেছেন।

মঠমাতা ইহা দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠেন ;···আজকের দিনে কিছু পরিমাণ লঘুচিত্ততা মার্জনীয়, কেন না এই পরীক্ষার্থীদের জীবন-সঙ্গিনীই সূর্যকুমারীদের হতে হবে। উৎসব এদের কাছে হয়ত পূর্বরাগের সূত্র মাত্র; কিন্তু তাই ব'লে এত হাসাহাসি এত চ্যাঁচামেচির কি হ'য়েছে। তোমরা আমার মঠের মেয়ে; ইংকারাজ এ শালীনতার অভাব দেখলে বলবেন কি ?···

মঠমাতার কঠোর অগ্নিবর্ষী দৃষ্টির ইঙ্গিতে সূর্যকুমারীরা নীরব হইয়া যান। কিন্তু এ গাম্ভীর্য কতক্ষণ রাখা যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার আরম্ভ হয় তাঁহাদের প্রগলভ গুঞ্জনধ্বনি। সামন্ত বিদ্যার্থীরাও সকলেই নিজের নিজের কৃতিত্ব সূর্যকুমারীদের দেখাইতে সচেষ্ট।

কেবল আখাউল্লা অপাঙ্গ দৃষ্টিতে মধ্যে মধ্যে রাজকুমারীকে দেখিয়া লইতেছেন। যখনই তাকাইয়াছেন তখনই দেখিয়াছেন যে রাজকুমারী চোখ ফিরাইয়া লইলেন। কয়বার এইরূপ হইবার পর, একবার আখাউল্লার মুখে ফুটিয়া উঠিল হাসির ঝলক; প্রত্যুত্তরে অপর এক ওষ্ঠকোণে ফুটিল স্মিত হাস্যের রেখা। এ জিনিস রাজপুরোহিতের দৃষ্টি এড়ায় নাই।

ওলিয়া কটাক্ষে এক একবার যুবরাজকেও দেখিতেছিলেন···

যুবরাজ উৎসবে খুব আনন্দ পাচ্ছেন বলে মনে হয় না; যেন দায়-সারা ভাবে একটা রাজকার্য করে যাচ্ছেন; কি যেন একমনে ভাবছেন, না হ'লে ললাটে কুঞ্চন রেখা কেন? বোধ হয় বলিরেখা, বয়সও তো হলো। এত নিস্পৃহতা কেন? এ আমার একটুও ভাল লাগে না। এত লোকজনের মধ্যেও তিনি যেন একা। সিন্ধু-শকুন জলে ডুব দিলেও তার ডানায় যেমন জল বসেনা, সেইরকম যুবরাজের সম্ভোগের সকল উপচারের মধ্যেও যেন ভোগে অনাসক্তি। মাকে চন্দ্রদেবী কোলে টেনে নেবার পর থেকেই আর দাদাকে সত্যিকার দেখবার লোক নেই। কাজ, কাজ, কাজ, দিবারাত্র কাজ; অন্তঃপুরের মেয়েদেরই বা দোষ কি···

আবার মিলন হয় চারটি চোখের। অন্য কেহ এরূপভাবে তাকাইলে ওলিয়ার চোখে অশোভন লাগিত; কিন্তু এখন সেরূপ কিছু বোধ হয় না; ইহাতে আছে—এক উদ্দীপনা, এক অভিনব অনুভূতি।

সেনাপতি উচ্চকণ্ঠে বলিয়া চলিয়াছেন "আজ যত বিষয়ের পরীক্ষা হ'লো এ ছাড়া সামন্তপুত্রগণ, আরও অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছেন;—কুইপাস পাঠ, বিজিত দেশের প্রজাদের আয়ত্তে আনবার কৌশল, শত্রু শিবিরে ফেলবার জন্য অগ্নিগোলক তৈরীর প্রক্রিয়া, বিভিন্ন প্রকার মেষের রক্ষণাবেক্ষণের শাস্ত্র, অস্ত্র নির্ম্মাণ, আরও কত নূতন নূতন বিদ্যা। আমি জোরগলায় বলতে পারি যে এই বিশাল ইংকাসাম্রাজ্যে, এই বয়সের যুবকদের ভিতর, রণকৌশলে এদের সমকক্ষ আর কেউ নেই।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে কি যেন ঘটিয়া গেল। আথাউল্লা স্থান কাল পাত্রের জ্ঞান ভুলিয়া বলিয়া উঠিলেন "ক্ষমা করবেন সেনাপতি; আমি বিজিত দেশের লোক, তবু জোর করে বলতে পারি, যে

এদের মধ্যে যুদ্ধবিদ্যায় যে সবচেয়ে পারদর্শী তাকে আমি সর্বসমক্ষে পরাজিত করবো। আজই, এখনই; এই মল্লভূমিতে।" আথাউল্লা আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ব্যাপার কি ঘটিল লোকে বুঝিতে পারেনা। কুতূহলী জনতার কাকলী সজীব হইয়া উঠে।

"এরা জ্যোতিষশাস্ত্র জানে? রসাগারের কাজ এদের রাজ-পুরোহিত কিছু শিখিয়েছেন? এরা অসিক্রীড়ার সময়ের শার্দুলাসন জানে? বরফে ঢাকা গিরিবর্ত্মের উপর দিয়ে সেতু তৈরী ক'রতে শিখেছে? এদের তরবারি এত ছোট কেন? ইহার দুই দিকে ধার নেই কেন? ঝুমঝুমি সাপের চলার ধ্বনি নকল ক'রে এরা শত্রুকে বিভ্রান্ত করতে শিখেছে? উত্তর দিন সেনাপতি।" ক্রোধোত্তেজিত আথাউল্লার কণ্ঠস্বর বহুক্ষণ শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে। এই অপ্রত্যাশিত ধৃষ্টতার পর ক্ষুব্ধ সামন্তের দল, অতিকষ্টে নিজেদের সংযত করিয়া রাখে। ইংকারাজের সম্মুখে কিছু বলিতে পারে না। তিনি নীরব নির্বিকার হইয়া বসিয়া আছেন।

অবশেষে সেনাপতি বলেন "একমাত্র ইংকাবংশের সন্তানরাই এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে।" ক্রোধে, অপমানে আথাউল্লার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া ওঠে। উদ্ধত হাত গিয়া পড়ে কোষবদ্ধ অসিতে। কাঁধে অনুভব করেন লঘু করস্পর্শ। দেখেন —তাঁকে নিবৃত্ত করার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছেন যুবরাজ।

হঠাৎ চোখ পড়ে ওলিয়ার ওপর;···ভয়ে তার মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গিয়েছে; মিনতিভরা দৃষ্টি বলতে চায়, যা হবার হয়েছে আর পাগলামি করোনা···

আথাউল্লা মাথা নীচু করিয়া আসনে বসিয়া পড়েন।···শিকলে বাঁধা পড়েছে জাগুয়ার, উদ্যতফণা সাপের সম্মুখে রাখা হয়েছে মন্ত্রৌষধি।···

যেন কিছুই হয় নাই এইরূপ ভাব দেখাইয়া উঠিয়া দাঁড়ান ইংকারাজ। এক এক করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসেন ইংকাপুত্ররা। অসিমুখ দিয়া মহারাজ তাঁহাদের প্রত্যেকের কানের উপরিভাগে ছিদ্র করিয়া দেন। তাহার পর রুধিরাক্ত হাতে পরাইয়া দেন দুইটি করিয়া স্বর্ণবলয়। তাহারা নতজানু হইয়া, রাজা ও যুবরাজের পদচুম্বন করিয়া চলিয়া যায়। সকলের কর্ণবেধ হইয়া গেলে, রাজা ডাকেন আথাউল্লাকে। রাজপুরোহিত কিছু বলিবার আগেই তাহার কানেও ছিদ্র করিয়া পরাইয়া দেন, ঐ একই চক্রাকার কুণ্ডল। বলেন "তোমাকে আমি সর্বসমক্ষে ইংকা স্নাতক বলে গ্রহণ করছি।"

আথাউল্লার কর্ণবেধের সময় ওলিয়া চোখ বুঁজিয়া ফেলে; তাহার সারাগায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে। ইচ্ছা হয় নিজহাতে উদ্গত রক্তধারা মুছাইয়া দেয়।

আথাউল্লা পিতাকে প্রণাম করিয়া আবার আসন গ্রহণ করেন। রাজকুমারী অনুচ্চ স্বরে যুবরাজকে বলেন—"বিদেশী ভাই ইংকারাজ্যের রীতি জানেন না, তাই তোমাকে প্রণাম করলেন না।" তাঁহার এই ত্রুটি ঢাকিবার চেষ্টাকে হুয়াস্কার অনুযোগ মনে করিয়া, এ প্রসঙ্গ বন্ধ করিতে ইঙ্গিত করেন।

এক অপ্রত্যাশিত তিক্ততার মধ্যে সমাবর্ত্তন উৎসব শেষ হয়। উৎসবের অঙ্গের মধ্যে আর কেবল বলিদান বাকি।

সেনানায়কেরা মল্লভূমির মধ্যে লইয়া আসেন, সোনার শৃঙ্খলে বাঁধা একটি প্রকাণ্ড 'আলপাকা' ভেড়া। আলপাকাটিকে ঊর্দ্ধমুখ করিয়া শোয়াইয়া ফেলা হয়। নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজিয়া ওঠে। চারজন সেনানায়ক তাহার চারিটি পা চারিদিকে টানিয়া ধরিয়াছেন। সেনাপতি আলপাকাটির মুখ চাপিয়া ধরেন। বৃদ্ধ রাজপুরোহিত সোনার তরবারি লইয়া ঐ স্থানে গিয়া দাঁড়ান। অভ্যস্ত হাতে তিনি

জানোয়ারটির বুকের ঊর্দ্ধদেশ হইতে, উদরের নিম্নদেশ পর্যন্ত চিরিয়া ফেলেন। ব্যথাকাতর জন্তুটির উদর হইতে বাহির হইয়া আসে অন্ত্রের কুণ্ডলী। সূর্যকুমারীরা হঠাৎ স্তবগীতি গাহিতে ভুলিয়া যান, বাদ্যধ্বনি বাদ্যকারের অজ্ঞাতে কখন থামিয়া যায়। রাজপুরোহিত কুণ্ডলীকৃত অন্ত্রের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। ইংকারাজ, যুবরাজ সূর্যকুমারীরা, সামন্তের দল, প্রজামণ্ডলী, সকলেই উদগ্র প্রতীক্ষায় ঐ দিকে তাকাইয়া থাকে। এক অধীর উত্তেজনায় বায়ুমণ্ডল থমথমে হইয়া উঠে। সেনানায়কেরা লক্ষ করে যে রাজপুরোহিতের মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। আরও, আরও গভীর মনোযোগের সহিত তিনি ঐ অন্ত্রের কুণ্ডলী পরীক্ষা করিতেছেন। সকলের বুক ভয়ে কাঁপে। রক্তরঞ্জিত বেশে বৃদ্ধ রাজপুরোহিতকে ভয়ঙ্কর দেখাইতেছে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় তিনি বলেন "আগামী বছরের যে ছবি অন্ত্রচিত্রে দেখলাম তা অতি ভয়ানক। এত বছর বয়স হ'ল, কিন্তু এত খারাপ ছবি আমি আর কখনও দেখিনি ; এমন কি শুনিওনি।"

মহারাজের উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে ভীতির চিহ্ন সুস্পষ্ট।

পুরোহিত আকাশের দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেন "দেখতে পাচ্ছ ?"

সকলে তাকাইয়া দেখে। রক্তমাখা বলিটির বহু ঊর্দ্ধে একটি ঈগল উড়িতেছে। একটি শ্যেন তাহাকে বারবার আক্রমণ করিতেছে। আর পূর্বাকাশ হইতে সেই দিকেই তীরবেগে উড়িয়া আসিতেছে একটি কণ্ডর। রাজপুরোহিত বলেন "সূর্যজ্যোতিষ অনুযায়ী, আশু অমঙ্গলের সকল লক্ষণই বর্ত্তমান। এ সম্বন্ধে সব কথা পরে একান্তে হবে। তোমরা প্রাসাদে ফিরে যাও। আমি আবার দেবাদিদেবের পূজায় বসি !"

অজ্ঞাত আতঙ্কের ছায়ায় সামন্তদের উৎসব শেষ হয়। ভারাক্রান্ত

হৃদয়ে রাজা, যুবরাজ, প্রাসাদে ফিরিয়া আসেন। এই বিষাদের ছোঁয়াচ জনতারও লাগে। ইংকারাজ যখন প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন জনতা অভ্যাস মত জয়ধ্বনি দেয়। সে জয়ধ্বনি, শবদেহ লইয়া যাইবার সময়ের ধ্বনির ন্যায় প্রাণহীন মনে হয়। এক খণ্ড মেঘ সূর্যদেবকে ঢাকিয়া ফেলে।

রাজধানীর উপকণ্ঠে যুক্তা পাহাড়ের শিখরে সূর্যকুমারীদের মঠ। দুই সহস্র সূর্যকুমারী সেখানে শিক্ষা গ্রহণ করেন। রাজ্যের সকলেই জানে যে এই শূন্যগর্ভ পাহাড়ের তলদেশে আছে এক বিরাট গহ্বর। সেই গহ্বরের নীচের ফাটলে জ্বলে, পাতালের আগুনের অনির্বাণ শিখা। এই গহ্বরে দুইটি কক্ষ। তাহারই একটিতে আছে, চৌদ্দজন মৃত ইংকারাজ ও তাঁহাদের মহিষীদের মৃতদেহের 'মমি'—রাজপুরোহিতদের রসশালার ঔষধ দিয়া সুরক্ষিত। সূর্যলোকে যাহাতে তাঁহাদের কোন কষ্ট না হয়, এই উদ্দেশ্যে, প্রতি মৃতদেহের পাশে রাখা আছে, তাঁহাদের জীবদ্দশায় ব্যবহৃত সকল প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, প্রচুর সোনার তৈজস পাত্র, আর গোমেদ ও মরকতের রাশি।

আর একটি কক্ষকে ইংকারাজেরা বলেন ধূপঘর। রাজপ্রাসাদ হইতে এখানে আসিবার সুড়ঙ্গ পথ আছে। সে পথে আসিবার অধিকার আছে, কেবল ইংকারাজ আর যুবরাজের। সূর্যকুমারীদের মঠের মঠমাতার কক্ষের ভিতর দিয়া আছে আর একটি পাথরের সংকীর্ণ সিঁড়ি। উপর হইতে ধাপে ধাপে নামিয়া আসিয়াছে এই সিঁড়ি, অন্ধকার পাতালপুরীর ধূপঘরে। যুগ যুগ হইতে সামন্তদের ছেলেমেয়েরা, মায়ের কোল ঘেঁষিয়া বসিয়া, আর ঠাকুরমার বিছানার মধ্যে শুইয়া শুনিয়া আসিয়াছে, এই পাতাল-পুরীর কাহিনী।···তৈরী করাইয়াছিলেন প্রথম ইংকারাজ। সূর্যশত্রুর

উপাসক রাজন্যবর্গ তখন রাজত্ব করিতেন কুজকোর নিকটের রাজ্যগুলিতে। শত্রুর আক্রমণের সময় সূর্যমন্দিরের বিগ্রহ, আর রাজপরিবারের লোকেরা যাহাতে নিরাপদে থাকিতে পারেন, তাহারই জন্য তৈয়ারী হইয়াছিল, এই রহস্যের আঁধার মহল। তাহার পর হইতে চিরকাল ইংকারাজেরা যখন রাজধানীতে থাকেন, তখন প্রতি অমাবস্যার রাত্রে, তাঁহারা পাতাল সূর্যের অর্চনা করিতে আসেন, এইখানে—বাহিরের চন্দ্রসূর্য অমাবস্যার রাত্রে এইখানেই নিদ্রা যান কিনা সেইজন্য।···ইহা ছাড়া আরও যে কথা ঠাকুরমারা জানেন, তাহা কাহারও কাছে বলার কথা নয়। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ভাগ্যবতী, তাঁহাদের ঐ ধূপঘরের একটি রজনীর কথা সকলেরই মনে আছে। অমাবস্যার পর হইতে সারা মাস চলিত সূর্যকুমারীদের মধ্যে কত জল্পনা কল্পনা, কত রঙ্গ কৌতুক। পরের অমাবস্যার রাত্রিতে সূর্যকুমারীরা নিদ্রার ভান করিয়া শুইয়া আছেন; মন আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্বে দুলিতেছে; পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরে ঢোকেন মঠমাতা। সুরূপাদের ভিতর হইতে একজনকে নিঃশব্দে ঠেলিয়া তোলেন। তাহাকে সঙ্গে লইয়া যান নিজের কক্ষে। মন্ত্রবলে তাঁহার ঘরের দেওয়ালের মধ্যে খুলিয়া যায় একটি দ্বারপথ। তিনি কানে কানে বলেন, "চৌদ্দসিঁড়ি নেমে ডান দিকে ধূপঘর; অন্ধকারে পা সামলে।" তাহার পর যাহার যেমন বরাত; কাহারও বা স্থান হয় ইংকারাজের অন্তঃপুরে; কাহাকেও বা আজীবন সন্তুষ্ট থাকিতে হয় ঐ একরাত্রির স্মৃতির গর্ব লইয়া।···

এ সব গল্পের মত মনে হয় বর্তমান সূর্যকুমারীদের। তাহাদের দুঃখ যে···হুয়ানোকুপাক বিশ বছর হতে কুইটোতে; রাজকুমার আবার আর এক ধরণের মানুষ; রাজপুরোহিত হলে তাঁকে মানায় ভাল।

…যে বৎসর হইতে ওলিয়া এই মঠে আসিয়াছে—আর তাহাও তো কম দিন হইল না—যুবরাজ আর পাতাল সূর্যের গুহার দিকে আসেনই না; আসেন কেবল এক মায়ের মৃত্যুতিথিতে, আর এক পিতৃপুরুষদের দেহকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার দিবস। ভ্রাতাভগিনী দুইজনে মিলিয়া এই শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন; সূর্যকুমারীরা নিজেদের ভাগ্যের দোষ দেয়।

মকরসংক্রান্তির উৎসবের পর হইতে হুয়ানোকুপাকের শরীর আরও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। রাজপুরোহিতই একাধারে রাজবৈদ্য ও রাজজ্যোতিষী। তিনি রসাগারে কত প্রকারের কষায়, অরিষ্ট, অবলেহ নিত্য নূতন প্রস্তুত করিয়া দেন ইংকারাজের সেবনের জন্য। কিন্তু তাঁহার শরীর দিন দিনই খারাপ হইতে থাকে। রাজপুরোহিতের কুঞ্চিত ললাটে দেখা দেয়, গভীরতর চিন্তারেখা;—মনে মনে ভাবেন অশুভ বর্ষফল কেবল সূর্যপুত্রের জীবনের উপর দিয়া গেলেই মঙ্গল। বৃদ্ধ হুয়ানোকুপাক সময় নাই, অসময় নাই তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান; নিজের রোগের কথা বলিতে নয়, দেশের ভাবী অমঙ্গলের বিশদ বিবরণের জন্য।—সূর্যবিধানে আছে সন্তানদের পাপে ক্ষুব্ধ হইয়া মার্তণ্ডদেব নিজে পাঠাইবেন তাঁহার অনুচরদলকে এই স্বর্গরাজ্যকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য। তাহাদের চারখানি পা, দুইটি মুখ—একটি মুখ প্রকাণ্ড লামা ভেড়ার মুখের মত, আর একটি মানুষের মত। তাহাদের হাতে থাকিবে মার্তণ্ডদেবের অমোঘ অস্ত্র বজ্রবাণ। রাজা স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে এদিন সন্নিকট।…প্রশ্নবাণে রাজপুরোহিতকে মহারাজ জর্জর করিয়া তোলেন।

এদিকে মঠে অন্যান্য সূর্যকুমারীরা ওলিয়ার মনের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে। ভাবী ইংকারাণীকে সমীহ করিয়া কথা বলিতে হয়; সব কথা পরিষ্কার করিয়া জিজ্ঞাসাও করা যায় না। তাহারা নিজেদের

মধ্যে বলাবলি করে···আর কোন রকমে একটা বছর; বাইশ বছর পূর্ণ হ'লেই তো ইংকারাণীর কুমারীত্ব ঘুচবে।···

ঘুরিয়া ফিরিয়া একটি গর্বোন্নত বলদৃপ্ত মুখের কথা ওলিয়ার মনে পড়ে···'যে সব চেয়ে পারদর্শী তাকে আমি পরাজিত ক'রবো'—এখনও যেন কথার ধ্বনি কানে আসছে। আথাউল্লার ওষ্ঠকোণের সেই হাসিটি···মনে পড়িতেই নিজেই হাসিয়া ফেলেন। মঠমাতা উপহাস করিয়া বলেন "বুনছো ভিকুনা পশমের কাপড় ইংকারাজের জন্যে, তার মধ্যে আবার ঠাকরুণের হাসি এল কেন?" ওলিয়ার মুখে অপ্রস্তুত হইবার ভাব ফুটিয়া ওঠে, গোপন দুর্বলতার পূর্বাভাস ধরা পড়িয়া গেল নাকি? ইহা যে তাহার মনের দুর্বলতা, এ সম্বন্ধে সে নিজের কাছেই নিঃসন্দেহ নয়। নিজের মনকে ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু সূর্যমন্দিরের বিগ্রহের উপর যে একটি বিশাল আয়তনের চোখ আঁকা আছে, তাহার দৃষ্টিরশ্মি যে অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে। তাহার কাছে কি একথা গোপন আছে। দাদার কথা কি ওলিয়া কখনো ভাবেনা? কিন্তু কয়বার, কতক্ষণ? নিজে ভাবিয়া নিজেই লজ্জিত হইয়া উঠে। মঠের অসংখ্য কাজের মধ্যে সে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিতে চায়।

যুবরাজ আর আথাউল্লার মধ্যে বেশ সৌভ্রাত্রের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে—ছোট ভাই; ছেলে মানুষ; দেশ ছাড়িয়া আসিয়াছে; এখানে সামন্তদের নিকট হইতে পদোচিত মর্যাদা পায় নাই। যুবরাজ সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহারে এসব ব্যথা ভুলাইয়া দিতে চান। আথাউল্লাকে খুশী রাখিতে পারিলে বৃদ্ধ পিতাও সুখী হন; কত দিনই আর বাঁচিবেন; তাঁহার আদরের সন্তান।···

পিতার সন্তোষের জন্য, আর সামন্ত কর্ম্মচারীদের উপেক্ষা হইতে

আথাউল্লাকে বাঁচাইবার জন্য, হুয়াস্কার তাহাকে নিজের মহলে লইয়া রাখেন। রাজকার্য শেষ হইলে গভীর রাত্রি পর্যন্ত তাহার সহিত চলে গল্পগুজব, আর ক্যাকোর মদিরময় পানীয়ের ধারাপ্রবাহ। ইংকারাজের সহিত হুয়াস্কারের দেখা হয় প্রতিদিন প্রাতঃকালে। আথাউল্লার 'চিচা' পান করার অভ্যাস নাই, এদেশের গরম তাহার সহ্য হয় না, ক্যাকোর সরবৎ সে খুব ভালবাসে, এই সব গল্প হুয়াস্কারের মুখে শুনিয়া হুয়ানোকুপাক খুশী হইয়া ওঠেন,...ভাই ভাইকে ভালবাসবেনা।...

হঠাৎ একদিন সুদূর তুম্বেজ প্রদেশের রাজপ্রতিনিধির নিকট হইতে কুইপাসে খবর আসে, যে "সেই এলাকায় সমুদ্রতীরের একটী গ্রামে, রাজপ্রাসাদের মত একটি প্রকাণ্ড নৌকা লাগিয়াছিল। উহা হইতে নামিয়াছিল কয়েকটি কিম্ভূতকিমাকার জীব, যাহাদের চারিটি পা, অবয়বের আয়তন 'লামা'র বিশ গুণ; সম্মুখের মুখটি আলপাকার ধরণের; আর পিঠের মধ্য হইতে উঠিয়াছে আর একটি মাথা; এই মুখটি মানুষেরই মত দেখিতে। জন্তুগুলি ছিঁড়িয়া দুই টুকরা হইয়া যাইতে পারে, আবার ঐ দুই বিচ্ছিন্ন অঙ্গ আগেকার মত সংযুক্ত হইয়া এক হইয়া যাইতে পারে। ইহা ঐ গ্রামের শতনায়কের প্রেরিত সংবাদ। আমি তদন্তে যাইতেছি, পরে বিশদ বিবরণ দিব। ঐ শতনায়ক বিশ্বাসী লোক বলিয়াই, তদন্তের পূর্বে এই খবর ইংকারাজের নিকট পাঠাইবার দুঃসাহস করিলাম। ঐ অঞ্চলের লোকেরা বিশেষ ভীত হইয়া পড়িতেছে, শোনা যাইতেছে।" হুয়াস্কার রুগ্ন পিতাকে রাজকার্যের জন্য বিব্রত করিতে চাহেন না। কিন্তু এ খবর তাঁহাকে না দেওয়া যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। সংবাদ শুনিয়াই ইংকারাজের রোগজীর্ণ মুখে ভীতির চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠে। রাজপুরোহিতের ডাক পড়ে। তিনি স্থির হইয়া সব শোনেন।

ইংকারাজের আতঙ্কের ছায়া তাঁহার মুখের উপরও প্রতিফলিত হয়। বহুক্ষণ গোপন আলোচনা চলে। স্থির হয়, সেই রাত্রেই জন কয়েক বিশ্বস্ত অনুচর মাত্র সঙ্গে লইয়া, যুবরাজ তুম্বেজের দিকে যাইবেন—প্রকৃত ঘটনা কি তাহারই সংবাদ লইতে। হুয়াস্কার বিদায় লইবার সময়, পিতা তাঁহাকে বিশেষ নির্দেশ দিয়া দেন, "তাদের হাতে বজ্রবাণ ছিল কিনা সে বিষয়ে খোঁজ নিতে ভুলোনা।" বৃদ্ধ পিতার অহেতুক আতঙ্কে যুবরাজের হাসি আসে।

হুয়ানোকুপাকের শরীর দিন দিন খারাপের দিকে যায়। শয্যাশায়ী নহেন। তবুও তাঁহার ইচ্ছা করে দিবারাত্র আথাউল্লা তাঁহার নিকটে থাকুক। হুয়াস্কার চলিয়া যাইবার পর, রোগগ্রস্ত পিতার সঙ্গে সঙ্গে থাকা, আথাউল্লার আরও একঘেয়ে লাগে।

ইংকারাজের পুরানো কালের কথা সব মনে পড়ে,...সেই ব্রীড়াময়ী রাজমহিষী;...ইচ্ছা করে বৃদ্ধ বয়সে পুত্র কন্যা পরিবারের সকলকে নিয়ে, একসঙ্গে থাকতে,—জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়টি তাদের সাহচর্যে কাটাতে। ইংকারাজের লক্ষ লক্ষ সন্তানের মঙ্গলেচ্ছায় নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া এ বয়সে আর ভাল লাগেনা। ওলিয়া যদি অষ্টপ্রহর কাছে থাকতে পারত; কিন্তু আরও বছরখানেকের পূর্বে তা সম্ভব নয়। বড় দেখতে ইচ্ছা করে ওলিয়াকে; কেবল ওলিয়াকে নয়, হুয়াস্কার আর ওলিয়া দুজনকে একসঙ্গে। ওলিয়ার মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী তিথি পড়েছে আগামী অমাবস্যায়। সে পুণ্যবতীকে কুড়ি বৎসর আগে দেখেছিলাম। বড় ইচ্ছা করে তার দেহটিকে দেখতে। না থাকুক সে দেহে প্রাণ, কিন্তু আমারই জন্য সে পাতালসূর্যের মন্দিরে অপেক্ষা করছে। মৃত্যুতিথিতে তাকে একবার দেখব।...

তখনই রাজপুরোহিতকে সংবাদ দেওয়া হয়। পুরোহিত মৃদু

আপত্তি জানান "পারবেন তো এই শরীর নিয়ে?" হুয়ানোকুপাক সেকথা কানে তোলেন না। রাজপুরোহিত মঠমাতাকে খবর দেন যে আগামী অমাবস্যায় রাণীমাতার মৃত্যুতিথিতে পাতাল সূর্যের মন্দিরে রাজকুমারীকে যেন পাঠান হয়—মায়ের দেহের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে।

অমাবস্যার রাত্রি গভীর হইলে হুয়ানোকুপাক আথাউল্লাকে ডাকেন। রুগ্ন শরীরে সুড়ঙ্গ পথে অতদূর একা যাইতে সাহস করেন না; আর বোধহয় আথাউল্লার এখানকার একঘেয়ে জীবনে একটু বৈচিত্র্য আনিবার জন্যও তাহাকে যাইতে বলেন। এ সব কাজে আথাউল্লার কোন দিনই আপত্তি নাই। সম্রাটের কক্ষ হইতে সুড়ঙ্গের সিঁড়ির আরম্ভ। আথাউল্লা আর হুয়ানোকুপাক গন্ধকের বর্তিকা হাতে লইয়া সুড়ঙ্গের পথে অগ্রসর হন। রাজমহিষীর দেহাবশেষ দেখিবার অদম্য আগ্রহে, তাঁহার শরীরের ক্ষমতা আজ কতটুকু সে কথা ইংকারাজ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কিছুদূর গিয়া পা আর চলে না। সুড়ঙ্গের গুমোট গরমে, আর গন্ধক বর্তিকার ধোঁয়ায় নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে। অবশেষে হতাশার স্বরে স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, অতদূর যাওয়া তাঁহার ক্ষমতায় কুলাইবে না। "তুমি একাই পাতাল সূর্যকে প্রণাম করে এসো।" আথাউল্লা পিতাকে তাঁর কক্ষের দিকে কিছুদূর আগাইয়া দেন। তারপর অভিনবত্বের রোমাঞ্চ লইয়া পাতাল সূর্যের গুহার দিকে সুড়ঙ্গপথে অগ্রসর হন। গন্ধকের আলোতে দেখেন, সুড়ঙ্গের অমসৃন দেওয়ালে একটি কাঁকড়াবিছা হঠাৎ আলো দেখিয়া পালাইবার চেষ্টা করিতেছে। তাঁহার মন এই শুভলক্ষণ দর্শনে আনন্দে ভরিয়া ওঠে। পাথরের মেঝের উপর পদশব্দের প্রতিধ্বনি মনে হইতেছে চতুর্দিক হইতে আঘাত খাইয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

সুড়ঙ্গের বায়ু মধ্যে মধ্যে তত গরম নয়; এই সকল স্থানে কেমন একটু হাল্কা হাল্কা মনে হয়; এখানে দম আটকানো ভাবটিও কম। বাতির শিখা এই সকল স্থানে আসিলেই সতেজ হইয়া ওঠে; চামচিকারা এখানে পাথরের দেওয়ালের ভিতর কোথায় যেন অদৃশ্য হইয়া যায়; পথের আর শেষ নাই। এইবার আরম্ভ হইল সিঁড়ি; কয়েক ধাপ যাইবার পর আবার সমতলভূমি; সুড়ঙ্গ আর তত অপরিসর নয়। গন্ধকের ধোঁয়ার উগ্রগন্ধ ও চামচিকার দুর্গন্ধ ভেদ করিয়া, যেন নাকে আসে ধূপের সুবাস। সম্মুখে নীলাভ আলোকের দ্যুতি। আগেই চোখে পড়া উচিত ছিল, কিন্তু চোখের নিকট বর্তিকার উজ্জ্বল আলোক থাকায়, ইহা নজরে পড়ে নাই। কোথায় পৌঁছিয়াছে বুঝিবার পূর্বেই আথাউল্লা দেখেন যে একটি বিরাট কক্ষের ভিতর তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। একটি মৃদু আলোকে চতুর্দিক উদ্ভাসিত। আলোটি যেদিক হইতে আসিতেছে সেই দিকেই দৃষ্টি গিয়া পড়ে। দূরে এক কোণের দিকে পাথরের ফাটলের মধ্য দিয়া বাহির হইতেছে, স্নিগ্ধ নীলাভ আলোকের অনেকগুলি কম্পমান শিখা। বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে ইহাই পাতাল সূর্যের দীপ্তি। আথাউল্লা ঐ ভাস্বর শিখাময়ূখকে প্রণাম করেন। তাহার পর নূতন আবিষ্কারকের দৃষ্টিতে চতুর্দিক দেখিতে আরম্ভ করেন;···সিংহাসনে উপবিষ্ট সারি সারি মনুষ্যমূর্ত্তি; স্তিমিত আলোকে বেশভূষা ভাল করে বোঝা যায় না; পুরুষ না স্ত্রীলোক? ইংকারাজের রক্তচক্র সকলের ললাটে,— বাল্যকাল থেকে দেখা, ভিখনা পশমের তৈরী, পিতার ললাটের অতি পরিচিত রাজচিহ্ন; এতে কি ভুল হবার জো আছে। পুরোহিতের রসশালার ঔষধ দিয়ে এইরূপ সুরক্ষিত শবদেহ তাহার কুইটো দেশেও অজ্ঞাত নয়। এইটাই তাহলে ইংকারাজবংশের শবরক্ষাগার। কিন্তু একি!···সর্বাপেক্ষা দক্ষিণের দেহটির সম্মুখে একব্যক্তি হঠাৎ

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে; ভয়ে আথাউল্লার দেহ মুহূর্তের জন্য কণ্টকিত হইয়া উঠে।

"হঠাৎ পায়ের শব্দে চম্‌কে উঠেছি।"

"কে, ওলিয়া?" গলার স্বরে আথাউল্লা ঠিক চিনিতে পারিয়াছে।

ওলিয়াও আবছা আলোকে এতক্ষণ চিনিতে পারে নাই। ভাবিয়াছিল ইংকারাজ আসিয়াছেন। কণ্ঠস্বর শুনিবার পর কি আর ভুল হয়—'যে সবচেয়ে পারদর্শী তাকে আমি পরাজিত ক'রবো···' অষ্টপ্রহর কানে যে ধ্বনি বাজে তা কি আর ভুল হওয়ার জো আছে।

"বাবা এলেন না?"

"আসছিলেন। তাঁর শরীরটা খারাপ। অর্দ্ধেক পথ থেকে ফিরে গিয়েছেন।" ওলিয়া পিতার সংবাদের জন্য ব্যস্ত হয়।—ভাবিয়াছিল আজ প্রাণ ভরিয়া তাঁহার সহিত গল্প করিবে, সারারাত পিতার কোলে মাথা রাখিয়া—যেমন রাজ্যের সাধারণ প্রজার মেয়েরা করে; কত গল্প, সেকালের গল্প; বাবাকে আর রাজধানী ছাড়িয়া যাইতে দিবেনা; একুশ বছরের সঞ্চিত গল্প একদিনে করিয়া লইবে। রাজদুহিতার কৃত্রিম জীবনের অস্বাভাবিকতা তাহাকে আষ্টেপৃষ্ঠে চাপিয়া ধরিয়াছে; এক মুহূর্তের জন্যও তাহাকে সুস্থির হইতে দেয়না; কেবল নিয়ম, বন্ধন, সূর্যবিধানের ভাষ্যের শৃঙ্খল! সঙ্গে সঙ্গে কি জানি কেন মনে পড়িয়া যায় দাদার কথা।

আথাউল্লাকে জিজ্ঞাসা করে "যুবরাজ কেমন আছেন?"

"ভাল"—অন্যকথা ভাবিতে ভাবিতে যন্ত্রের মত উত্তর দেয় আথাউল্লা।

এ গল্প, সে গল্প করিয়া কতক্ষণ লোকে নিজের মনকে ফাঁকি দিতে পারে? দুইজনের অন্তরের গহনে যে সকল দিবাস্বপ্নের বুদ্বুদ সংস্কারের প্রাচীরে আঘাত খাইয়া লীন হইয়া গিয়াছে আজ তাহারা

পূর্ণসুষমায় রূপান্বিত হইয়া উঠে। কি করিয়া রজনী কাটিয়া যায় তাহারা বুঝিতেও পারে না। পাতাল সূর্যের দ্যুতি কমিয়া আসে। বিদায় লইবার পর ধূপঘরের সুবাস ও বিভূতি দুইজনের দেহেই অনেকক্ষণ লাগিয়া থাকে।

পরের দিন হঠাৎ সূর্যগ্রহণ হইয়া যায়। সকলে জানে যে পৃথিবীতে পাপের বোঝা বাড়িলে সূর্যদেব আর তাহা নিজ চোখে দেখিতে না পারিয়া চোখ ঢাকিয়া লন। আর ইহা এক অতি অশুভ লক্ষণ। মঠে রাজকুমারীর প্রাণ কাঁপে, নিজকক্ষে আথাউল্লা বিচলিত হয়। হুয়ানোকুপাক রাজপ্রাসাদে পুরোহিতকে ডাকিয়া-পাঠান। রাজ্যশুদ্ধ লোক উপবাস করে মার্তণ্ডদেবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য।

হুয়াস্কার তুম্বেজে গোপনে সংবাদ লইয়া দেখেন যে খবর মোটামুটি ঠিক। কেবল ঐ অতিকায় চতুষ্পদটি ছিঁড়িয়া দুই টুকরা হইবার সংবাদটি ভুল। মিথ্যা ঠিক নয়, বুঝিবার ভুল। জানোয়ারটি একটি অতিকায় লামার মত; তাহারই পৃষ্ঠদেশে বসে সূর্যের মত রংএর মানুষ। সোনার উপর তাহাদের লোভ। আর সব চাইতে আশ্চর্য তাহাদের হাতে আছে শাস্ত্রোক্ত বজ্রবাণ। সেই বজ্রবাণের শক্তি দেখিয়া দুই একটি সমুদ্রতীরবর্তী গ্রামের লোক তুম্বেজে পলাইয়া আসিয়াছে। ইহার কোন উপায় এখনই করিতে হয়। আসিবার সময় বাবার কথা শুনিয়া হাসিয়াছিলাম; হাজার হইলেও বুদ্ধের কথা, অবহেলার বস্তু নয়। শীঘ্রই রাজধানীতে ফিরিয়া ইহার একটা বিহিত রাজপুরোহিতকে বলিয়া করিতেই হইবে। তিনি রাজধানীর দিকে যাত্রা করেন।

রাজধানী হইতে একমাস দূরের পথেই বার্তাবহ জরুরী সংবাদ লইয়া আসে যে, সূর্যপুত্র ছুয়ানোকুপাকের সূর্যপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে; সেও আজ প্রায় ত্রিশ দিনের কথা। এ সংবাদে হুয়াস্কার মর্মাহত হন;···শেষ বয়সে যদিই বা বাবা দেশে ফিরলেন, তথাপি এমনই দুর্ভাগ্য যে শেষ সময়ে তাঁর সহিত দেখাই হল না···। বজ্রবাণের সংবাদ পাইবার পর অশুভ লক্ষণগুলি, তাঁহাকেও বিচলিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে।—এই সময় প্রয়োজন ছিল, পিতার মত লোকের উপদেশের। কুড়ি বছর থেকে পিতার কোনপ্রকার সাহায্য ব্যতিরেকেই রাজকার্য পরিচালনা করেছি। তবুও মনে হত মাথার উপর আর একজন আছেন; সাম্রাজ্যের গুরুদায়িত্ব-ভার তাঁরই; তাঁরই প্রতিনিধিরূপে কাজ করছি; ওলিয়া যদি এখন কাছে থাকত তা হলেও মনে একটু শান্তি পেতাম; সে বেচারীই বা এখন কি করছে; মা নাই, বাবা গেলেন, আমি থাকলাম এখানে; সে আবার যে মেয়ে—দুঃখে তার মন গুঁড়া গুঁড়া হয়ে গেলেও সে তা প্রকাশ করবে না; কোলে পিঠে করে ঐ একরত্তি ওলিয়াকে মানুষ করেছিলাম; তাকে জানতে তো আর বাকি নাই। রাজকার্যের মধ্যে ডুবে থাকি; কতদিন থেকে তার সঙ্গে প্রাণখোলাভাবে কথা বলি না। কিছুদিন পরে, আর বছরখানেক পর সব ঠিক হয়ে যাবে। আর এক বৎসর পর আমাদের মধ্যের সেই পূর্বেকার সহজ অনাবিল সম্বন্ধ আবার ফিরে আসবে তো? বাবার সূর্যপ্রাপ্তি সকলের চেয়ে বেশী বাজবে আথাউল্পার প্রাণে। ও আবার যা খামখেয়ালী; কি ক'রে বসে কে জানে। তাকে আবার ভালয় ভালয় কুইটোতে পাঠিয়ে দিতে পারলে হয়। এখন রইল পিতৃদেবের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের কাজ। দেহটি বোধহয় রাজ-পুরোহিত ঔষধ দিয়ে সুরক্ষিত করে প্রাসাদ কক্ষে রেখে দিয়েছেন।

মঠমাতা, যুবরাজ আর রাজকুমারী এই তিনজন মিলে ধরাধরি করে দেহটিকে সুড়ঙ্গপথে পাতাল সূর্যের মন্দিরে রেখে আসতে হবে ইহাই চিরাচরিত নিয়ম। মায়ের দেহের পাশে পিতার দেহটিকে রাখব আমি আর ওলিয়া।···চিন্তার আর কুল কিনারা নাই।···

হুয়াস্কার ফিরিবার পথে বহুদূর হইতে দেখিতেছেন তাঁহার প্রিয় কুজকো সহরকে। সূর্যমন্দির দেখিয়া ভক্তিতে শির আনত হইয়া আসে।···ঐ রাজপ্রাসাদের মিনার; ঐ য়ুক্কা পাহাড়। সূর্য-কুমারীদের মঠের গবাক্ষপথে ওলিয়া কি এখন এই শোক মিছিল লক্ষ্য করছে।...নগরের তোরণে সেনাপতি তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলেন, "আপনার বিশ্রামের পর আজ অপরাহ্নে সামন্তরা আপনার সহিত দেখা করতে চান্!"···হাবভাবে মনে হয় বিষয় গুরুত্বপূর্ণ; আবার কি হল!···

চিন্তাকুল হুয়াস্কার উত্তর দেন, "আজ নয়। কাল সূর্যদেব যখন লম্বা ছায়া ফেলবেন, তখন তাঁদের সকলকে রাজপ্রাসাদে আসতে বলবেন।"

হুয়াস্কার রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে রাজধানী শোকমগ্ন নয়। ইংকারাজের দেহ এখনও তাঁহার কক্ষে রক্ষিত, কিন্তু লোকে এখনই, রাজা হুয়াস্কার ও রাণী ওলিয়ার জয়ধ্বনি করে। হুয়ানোকুপাক বহুদিন যাবৎ কুইটোতে অবস্থানের জন্য তাঁহার সহিত প্রজাদের সেরূপ আন্তরিক সম্প্রীতির সম্বন্ধ ছিল না।

রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে রাজপুরোহিত দাঁড়াইয়া আছেন। হুয়াস্কারের সপ্রশ্ন দৃষ্টি তাঁর দিকে পড়িতেই, তিনি বলেন, "ইংকা-রাজের কক্ষেই তাঁর দেহ আছে। দেখে নিজের কক্ষে এসো, কথা আছে।"

কিছুক্ষণ পর যুবরাজ নিজের ঘরে আসিয়া দেখেন যে রাজপুরোহিত উত্তেজিতভাবে ঘরের মধ্যে পদচারণা করিতেছেন। কোন শিষ্টাচার নাই, কোন গৌরচন্দ্রিকা নাই, আরম্ভ হইল কাজের কথা,—"তোমার পিতার শেষ আদেশ কি জানো? আমি তো শেষ অবস্থায় অষ্টপ্রহর সেখানেই থাকতাম। তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন সেনাপতি ও প্রধান প্রধান সামন্তদের। তাদের উপর আদেশ দিয়া গিয়াছেন যে তুমি ও আথাউল্পা দুইজনই এই রাজ্যের উত্তরাধিকারী। তুমি পাবে পেরু ও চিলি; আথাউল্পা পাবে কুইটো রাজ্য।"

"এতে চিন্তার কি আছে? বাবা যখন মৃত্যুকালে এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তখন তো তা মানতেই হবে। এতো ইচ্ছা নয়, আদেশ। আথাউল্পা কোথায়?"

রাজপুরোহিত ক্রোধে জ্বলিয়া উঠেন, "পিতার আদেশ! সূর্য-বিধান বড়, না হুয়ানোকুপাকের মনের অভিলাষ বড়। বেছে নাও।···এই স্বর্গরাজ্য ভাগ হয়ে যাবে? এক অংশের উত্তরাধিকারী হবে রাজার জারজ সন্তান? সামন্তরা মানবে কেন? দেশের লোক শুনবে কেন? এ মেনে নেবার আগে পুড়িয়ে ফেলে দাও সূর্য-বিধান। একখান ক'রে খসিয়ে ফেল সব পাথর সূর্যমন্দিরের। পারবে?"

রাজপুরোহিতের চোখ দিয়া আগুনের স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। তিনি নিজের পদোচিত গাম্ভীর্য ভুলিয়া গিয়াছেন। দেখিতে এমন নিরাসক্ত হইলে কি হয়; লোকচক্ষুর অন্তরালে বংশ পরম্পরায় তাঁহাদেরই উপর থাকে, ইংকাসাম্রাজ্য সঞ্চালনের অক্ষদণ্ডের বোঝা। চোখের উপর এই রাজ্য টুকরা টুকরা হইয়া যাইতে দেখিবেন! ইংকারাজ্যে রাজত্ব করিবে এমন লোক যে সূর্যচন্দ্রের বংশোদ্ভূত নয়!

"বল, উত্তর দিচ্ছনা যে? আবার জিজ্ঞাসা করছিলে না আথাউল্লা কোথায়? ইংকারাজ সূর্যগত হবার পরদিনই সে চলে গিয়েছে কুইটোর দিকে। এখানকার সামন্তদের মধ্যে থাকতে ভয় পেয়েছিল বোধ হয়। আর ভয়ের কারণও ছিল। যে হুয়ানো-কুপাক জীবদ্দশায় রণকৌশলে কোনদিন একটুও ভুল করেন নি, তিনি মোহান্ধ হয়ে মৃত্যুকালে এত বড় ভুল করে যাবেন, তা' আমরা কোন দিনই ভাবিনি। সারা জীবন যে রাজ্যকে বাড়িয়ে গেলেন, মরবার সময় সে রাজ্যকে খণ্ডিত করার কথা ভাবলেন কি করে! এখন কি করবে, উত্তর দাও..."

"কিছুক্ষণ ভাববার সময় দিন, রাজপুরোহিত।"

"আবার সময়! ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে বাছবার জন্য সময়! তোমার স্থৈর্য তোমার দুর্বলতা। রাজপুরোহিতের ওটা গুণ হতে পারে, রাজার নয়।"

তথাপি হুয়াস্কারকে নীরব দেখিয়া পুরোহিতের হঠাৎ খেয়াল হয় যে এখন থাক। এখন উহার মন এত শোকসন্তপ্ত যে হয়ত রাজকার্যের কথা ভাল লাগিতেছে না।...ঐ তো চোখের কোণে শুষ্ক অশ্রুধারার চিহ্ন।...হঠাৎ মনে পড়ে যে,...যে কাজে হুয়াস্কার তুম্বেজে গিয়াছিলেন, সে সংবাদের সত্যাসত্য কি তা জিজ্ঞাসাই করা হয় নি। আচ্ছা এখন থাক, পরে জিজ্ঞাসা করা যাবে। সূর্যগ্রহণের দিন থেকেই যে সৌরকলঙ্ক দেখা যাচ্ছে এ অশুভ লক্ষণের কথাও হুয়াস্কারের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।...

"আচ্ছা কাল আবার আমি তোমার সঙ্গে দেখা করবো। এখন তুমি খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করগে। আজ আবার তোমার সারারাত জাগতে হবে।"

সেই মায়ের তিথির রাত্রি হইতেই ওলিয়ার মনের মধ্যে ঝড় বহিয়া

চলিয়াছে। সুপ্ত মনের গোপন মাণিক হইতে আজ বিচ্ছুরিত হইতেছে স্নিগ্ধ দ্যুতি। এই দ্যুতি তাহার জগৎকে ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছে। তাহার জীবনের পরম চরিতার্থতায়, সে নিজেকে নিঃশেষ করিয়া বিলাইয়া দিয়াছে। কিন্তু…

এই কিন্তুই হইয়া উঠিয়াছে তাহার জীবনের নিগ্রহ। সূর্যবিধানের নিগড়ের লাঞ্ছন কি তাহার মন হইতে মুছিয়া যাইতে পারে? যুবরাজের সহধর্মিনী হইবে রাজকুমারী ইহাই ছিল ওলিয়ার কাছে একপ্রকারের সহজাত সংস্কার, যেদিন হইতে সূর্যচন্দ্র আকাশে বিরাজমান সেই যুগ যুগ হইতে ইহাই হইয়া আসিতেছে।…এই সূর্যচন্দ্রের বংশপরম্পরা রাখিবার দায়িত্ব তাহার উপর। তাঁহাদের অমোঘ নির্দেশের বিরুদ্ধে কি সে যাইতে পারে? ইংকাসাম্রাজ্য বাঁচাইয়া, রাখিবার গুরুভার তাহার উপর; লক্ষ লক্ষ প্রজার দৃষ্টি যে তাহারই উপর।…তা না হলে সূর্যবংশের রক্ত কলঙ্কিত হবে, মার্তণ্ডদেব অসন্তুষ্ট হবেন, দাদা মনে আঘাত পাবেন। ইংকা সাম্রাজ্য সমৃদ্ধ রাখার দায়িত্ব কেবল দাদার একার নয়। এ কেবল আমার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার প্রশ্ন নয়, দাদার ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার প্রশ্ন নয়, তাঁর প্রতি বিশ্বাসহীনতার প্রশ্ন নয়—এ তো স্বর্গরাজ্যের সহিত বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্ন।…

…কিন্তু আমি। নিজের বলে কি জীবনের কোন অংশ আমার নেই? সূর্য; সূর্য; পৃথিবী শুদ্ধই যদি সূর্যের, তবে সূর্যকুমারীদের জন্য এক বিধান, আর আমার জন্য অন্য বিধান কেন? তাদের তো দাদার সহিত বিবাহ করতে হয় না? আমার বেলাতেই কেবল এই অবাঞ্ছিত বিধানের শৃঙ্খল। কেন? মঠমাতা, যুবরাজ, রাজপুরোহিত এঁরা কি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন? না, না, এ আমার মনের গোপন কথা। ক্ষমা কর সূর্যদেব এরূপ কথা ভাববার জন্য। কেন

সূর্যবিধানের ওপর এ সন্দেহ? কেন এসব কথা আমার মনে উঁকি মারে? এসব কথা কি কাউকে জিজ্ঞাসা করা যায়? যুবরাজকে তো নয়ই—

কিন্তু সব প্রশ্নের, সব যুক্তির সমাধান করিয়া বিদায়ের সময়ের সেই কণ্ঠস্বরের মধুর রেশ কানে বাজে—"আমি শীগগিরই ফিরে আসবো তোমাকে নিতে; সে দিনও ধূপঘরে আমার জন্য প্রতীক্ষা ক'রো।"

হুয়ানোকুপাকের দেহের চারিদিকে সুগন্ধি গন্ধক বর্তিকা জ্বালিয়ে দিলেন ওলিয়া। ক্লান্ত মঠমাতা কপালের ঘাম মুছিলেন। তিনি ও হুয়াস্কার দুইজনে মিলিয়া দেহটি ধরাধরি করিয়া আনিয়াছেন পাতাল-পুরীর সূর্যমন্দিরে। ওলিয়া বাতি ধরিয়া পথ দেখাইয়াছিলেন। তাহার মুখের ভাব থমথমে, যুবরাজ লক্ষ্য করিয়াছেন;···সে শোকের ভারে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে; মনে হয় কত কি তার যুবরাজকে বলার ছিল; ছোটবেলা থেকে আঘাতের পর আঘাত পাচ্ছে সে; হয়ত মঠমাতা না থাকলে তাঁকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতো, শোকের ভার লাঘব করবার জন্য; স্বাস্থ্য কিন্তু তার অনেক ভাল হয়েছে এর মধ্যে—সেই মকর সংক্রান্তির দিন দেখেছিলাম; আর এই তো বয়স রূপ ও স্বাস্থ্যের পরিপূর্ণতার;···হুয়াস্কারের কোমল স্নেহপ্রবন মন ওলিয়ার নিঃসঙ্গতায় কাঁদিয়া ওঠে।···

ওলিয়া একবারও তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতে পারে নাই। ধীর পদক্ষেপে সে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া যায়।

মঠমাতার কৃত্রিমগাম্ভীর্যভরা মুখে ফুটিয়া উঠে কৌতুকের হাসি। বলেন, "বাইশ বছর পূর্ণ হবার পর ওলিয়ার বিয়ে আর সম্ভব নয়। এই মাসেই বিয়ের পর আনুষ্ঠানিক অভিষেক শেষ করতে হবে। পূতকীর্তি টুপাকেরও বিয়ের সময় রাণীমার বয়স ছিল সতর। দরকার হলে

রাণীমার কম বয়সে বিয়ে করার বৈকল্পিক বিধান সূর্যভাষ্যে দেওয়া আছে। আমি নিজে প্রথমে তোমাকে এই সুসংবাদ দেবো বলে রাজপুরোহিতকেও বলিনি এ কথা।"

হুয়াস্কার প্রথমে কথাটি বুঝিতে পারেন নাই। বোঝা মাত্র সূর্য-বংশের উষ্ণরক্ত অধীর উগ্রতায় শরীরের প্রতি স্নায়ুতে আঘাত করে। ইচ্ছা হয় মঠমাতার জিভ টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে। এ কথা কিছুতেই সত্য হইতে পারে না; কিন্তু মঠমাতা কেন মিথ্যা বলিবেন? যে আলো আঁধারের অবাস্তব পরিবেষ্টনীতে তিনি দাঁড়াইয়া তাহা স্বপ্নরাজ্য নয় তো? পাতাল সূর্যের লেলিহান শিখা, তাঁহারই দিকে ছুটিয়া আসিতেছে তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য; পূর্বপুরুষদের দেহ হইতে অশরীরী আত্মাগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া অদৃশ্য হস্তে তাঁহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছে; পাত্রভরা ক্যাকো পাতার নির্যাস এক নিশ্বাসে পান করিলে শরীর যেরূপ নিস্পন্দ ও অবশ হইয়া আসে, তাঁহার শরীরও সেইরূপ শিথিল ও স্পন্দহীন হইয়া গিয়াছে।···কে? কে সে? না, আর ভাববার ক্ষমতা নেই। ইচ্ছা হয়, এই মুহূর্তে ওলিয়ার নিকট গিয়ে এই প্রশ্নের অন্তিম নিষ্পত্তি করতে। কিন্তু এ কথা কি ওলিয়াকে জিজ্ঞাসা করা যায়?—ওলিয়া! এ কি করে সম্ভব হ'লো! অসম্ভব!···

মঠমাতা হুয়াস্কারের মুখের ভাবকে অপ্রস্তুত হইবার লক্ষণ মনে করিয়া, কৌতুকের জের টানিয়া চলিয়াছেন—"সেই মায়ের তিথির রাতে, মেয়ে যখন ভোর রাত্রে ফিরলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম রাজার সঙ্গে কুমার এসেছিলেন নাকি? রাজকুমারী জবাব দিলেন যে রাজা আসেননি। তখন বুঝি যে এই সন্ন্যাসী ঠাকুরের মতিগতি তা'হলে ফিরেছে। সত্যই সূর্যদেব মুখ তুলে চেয়েছেন।"···

"আচ্ছা, এ কথা কাউকে বলার দরকার নেই, এখনই'···কোন

দিকে না চাহিয়া হুয়াস্কার ভূতগ্রস্তের মত ফিরিয়া আসেন সুড়ঙ্গের পথে। মঠমাতা হুয়ানোকুপাকের শবদেহের নিকট হইতে একটি বাতি তুলিয়া লইয়া বলেন, "এটা নিয়ে যাও—অন্ধকারে যাবে কি করে?"···সে স্বর হুয়াস্কারের কানেও পৌছায় না।···

দুইদিন পরই গুপ্তচর সংবাদ আনে যে আথাউল্লা কুইটো হইতে বিরাট বাহিনী লইয়া কুজকোর দিকে অগ্রসর হইতেছে। সামন্তদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়িয়া যায়। রাজপুরোহিত পরামর্শ দেন যে শত্রুর দিকে অগ্রসর হইয়া প্রত্যাক্রমণ করাই রণকৌশলের দিক হইতে ভাল।

দুই দিন হইতে হুয়াস্কারও কত কথা ভাবিয়াছেন।···বিপদ একা আসে না। অমঙ্গলের ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে। ইংকাবংশকে শেষ আঘাত দিয়েছে ওলিয়া। তার উপর ক্রোধ হয়, দুঃখ হয়। সে কোন কথা বলেনি। বলতোই বা কি? এত শিক্ষা, দীক্ষা—সে শেষকালে এই করলো! তার সহিত ব্যবহারে কোন দিন কোন ত্রুটি করেছি বলে তো মনে পড়ে না। সূর্যবংশের বিরাট ঐতিহ্যের কথা সে ভুলল কেমন করে। আমার দিক থেকে সে জিনিসটি না ভাবুক, রাজ্যের দিকটাও তো ভেবে দেখা উচিত ছিল। না; ছেলেমানুষ সে—এ বিচ্যুতির কথা, সূর্যদেব ছাড়া আর কেউ কোন দিন জানতে পারবে না। কাউকে একথা জানতে দেব না।...

সৈন্যসামন্ত লইয়া যাত্রা করিবার পূর্বে হুয়াস্কার আনুষ্ঠানিক ভাবেই সূর্যকুমারীদের মঠে যান। মঠমাতাকে ডাকিয়া একান্তে অনুচ্চস্বরে কি সব কথা বলেন। কুতূহলী সূর্যকুমারীদের কানে কেবল শেষ কথাটি যায়—"যদি পরাজিত হই তা হলে"—

তাহার পর ওলিয়া প্রণাম করিতে আসিলে তাহাকে ইংকা-রাজ্যের প্রচলিত আশীর্বাণী "সতী হও" বলিয়া আশীর্বাদ করেন।

চেষ্টা করিয়াও ওলিয়া অশ্রুধারা রোধ করিতে পারেন না। মঠমাতা অশ্রু মুছাইয়া দেন, "কেঁদোনা মা, স্বামীর অমঙ্গল হবে। সূর্যপুত্র শত্রুকে পরাজিত করেই ফিরবেন।" কথাটি ওলিয়ার মনে অস্বস্তির সৃষ্টি করে।

সূর্যদেব ও পূর্বপুরুষদের প্রণাম করিয়া হুয়াস্কার নগরদ্বার হইতে বাহির হইয়া পড়েন। মঠের গবাক্ষপথে নিবদ্ধ দুইটি স্নেহভরা চোখের অশ্রু আর বাধা মানে না।

ক্যাক্সা মালাঙ্গার গিরিবর্ত্মে ঘোর যুদ্ধ চলিতেছে। প্রহরে প্রহরে দূত যুদ্ধের সংবাদ লইয়া আসিতেছে, রাজপুরোহিতকে দিবার জন্য। আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্ব চলিতেছে রাজপুরোহিতের অন্তরে। তাঁহার মত স্থিতধী লোকও আজ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি অভিচার ক্রিয়ায় নিমগ্ন থাকেন অষ্টপ্রহর। পুনর্বার নূতন বার্তাবহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে না আসা পর্যন্ত তিনি আর সুস্থির হইতে পারিতেছেন না। কুইটোর সৈনিকদের তরবারি, খবর পাওয়া গিয়াছে, অনেক বড়; তাহারা আবার শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিতেছে; আরও কত নিরাশাজনক খবর ইতিপূর্বেই পাওয়া গিয়াছে।··· সূর্যপুত্রকে পরাজিত করবে ইংকারাজের জারজ সন্তান? ইহাও কি সম্ভব? পেরুর এই স্বর্গরাজ্য কি ভেঙ্গে পড়বে?···

শেষ দুঃসংবাদ আসিল প্রাতঃকালে—গত সন্ধ্যায় হুয়াস্কার বন্দী হইয়াছেন। ইংকাসামন্তরা অনেকেই নিহত হইয়াছে। চিলির সামন্তরা এখনও যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছাইতে পারেন নাই। যুবরাজকেও বোধ হয় দুই একদিনের মধ্যে হত্যা করিয়া ফেলা হইবে।···দূত কাঁদিয়া ফেলে···সূর্যবিধানের কুইপাস ছুড়িয়া ফেলিয়া দেন রাজপুরোহিত। উত্তেজিত ভাবে তিনি উঠিয়া দাঁড়ান।

সূর্যকুমারীদের মঠে মঠমাতার নিকট এই নিদারুণ দুঃসংবাদ পাঠান। ইহাই নিয়ম; রাজধানীতে শত্রু আসিবার সম্ভাবনা হইলে মঠে খবর দিতে হয়। মঠমাতা পাতালপুরীর সূর্যমন্দিরে রাজভাণ্ডার রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। দরকার হইলে যাহাতে রাজ-পরিবারের মেয়েরাও পাতাল কক্ষে গিয়া থাকিতে পারেন, সে জন্যও ব্যবস্থা করিতে হয়।

কয়দিন ধরিয়া মানসিক দ্বন্দ্বের ঘাতপ্রতিঘাতে ওলিয়ার দেহ ও মন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।···যুদ্ধের ফলাফল কি হইবে তাহা সে ভাবিয়া পায় না। হুয়াস্কারের পরাজয় সে কল্পনাও করিতে পারে না, আবার আথাউল্লার পরাজয় সে চায় না। দুইজনে যুদ্ধ—অথচ দুই জনেরই বিজয় কি করিয়া সম্ভব? "আমি নিতে আসবো, ধূপঘরে থেকো কিন্তু"···থাকবো, নিশ্চয়ই থাকবো।···আবার কানে আসে উদার ক্ষমাশীল কণ্ঠের সেই স্বর "সতী হও"। দুইজনের মধ্যে এখন যদি সম্মানজনক সর্তে সন্ধি হইয়া যায়, তাহা হইলে রাজ্যের সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু তাহার নিজের সমস্যার কি আর সমাধান নাই? সে কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারেনা। অসহায়ভাবে সূর্যদেবকে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করে, দুইজনেরই মঙ্গল কর ঠাকুর!

মঠমাতা তাহাকে নিজের কক্ষে ডাকেন। বলেন, "যুবরাজের যুদ্ধে জয় হয়েছে। তিনি এখনই ফিরছেন। তুমি ধূপঘরে তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করো; তিনি খবর পাঠিয়েছেন।" কক্ষের দেওয়াল, মঠমাতার আকৃতি, আথাউল্লা, সূর্যমূর্তি ও পাথরের সিঁড়ির ঘূর্ণমান আবর্তের মধ্য দিয়া সে অন্ধকারের মধ্যে নীচে নামিয়া যায়।

যুবরাজের আদেশ মঠমাতার অক্ষরে অক্ষরে মনে আছে। মঠের প্রাঙ্গণে আছে বিরাট সূর্যমূর্তি; উজ্জ্বল পালিশ করা অবতল আয়নার মত। সূর্যচক্রটি এমনভাবে বসানো যে তাহার মুখ

চারিদ্বিকে ঘোরানো যায়। প্রাঙ্গণের এক কোণে রাখা আছে, টিনের খাদ দেওয়া তামার একটি চৌবাচ্চা। ঐ চৌবাচ্চা হইতে একটি প্রশস্ত পয়নালী গিয়াছে নীচে ধূপঘরের দিকে। পাতাল সূর্যের পূজার দিন মঠপ্রাঙ্গণের বিগ্রহের উপর প্রতিফলিত, পূত সূর্যালোক সমাহৃত করা হয়, এই গন্ধকের চৌবাচ্চার উপর। আগুন দিয়া এই গন্ধক জ্বালানো বিধিবহির্ভূত। ধূপঘরে রাখা হয় ধূপের স্তূপ, আর উপর হইতে মধ্যে মধ্যে ফেলা হয় জ্বলন্ত তরল গন্ধক। অফুরন্ত ধূপের ধোঁয়ার সৌরভ সে সময় কুজকো সহরের ভিতর পর্যন্ত পৌঁছায়।

মঠমাতা সূর্যদেবকে প্রণাম করিয়া, সূর্যমূতিকে একটু ঘুরাইয়া দেন। প্রখর সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া কেন্দ্রীভূত হয় গন্ধকের স্তূপে।

ওলিয়া এ সবের কিছুই জানেনা।···এই ধূপঘরে প্রতীক্ষা করতে আথাউল্লা বলে গিয়েছিল।...কিন্তু এ বন্ধ্যা প্রতীক্ষায় উদ্গত অশ্রু মুছিয়া, মুখে হাসি ফুটাইবার চেষ্টা করিতে হয়। ইহাতে সেদিনের উন্মাদনা কই?···সূর্যদেব, আথাউল্লার মঙ্গল কর। বিজয়ী হুয়াস্কারের নিকট চাইব আথাউল্লার প্রাণ ভিক্ষা; যুবরাজ অনুদার নয়, আমার কথা কি রাখবেন না? জীবনে কোনদিন তাঁর কাছে কোন অনুরোধ করিনি। ইংকারাজ্য বাঁচবে।...পৃথিবী এই রকমই চলবে। কেবল...আথাউল্লা!···যুবরাজ বলে গিয়েছেন “সতী হও”; ···কি করে?...

হঠাৎ উপর হইতে জ্বলন্ত গন্ধকের গন্ধে তাহার মন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। পরমুহূর্তে সে সব বুঝিতে পারে, ইংকারাণী যাহাতে শত্রুহস্তে না পড়েন, তাহার জন্য সূর্যবিধানঅনুযায়ী এই চিরাচরিত ব্যবস্থা।···তাহলে যুবরাজ পরাজিত হয়েছেন। আথাউল্লা!...এইবার

শান্তিতে মরতে পারবো, কিন্তু রাজ্যের প্রজারা জানবে ইংকারাজের সতী সূর্যচন্দ্রবংশের সম্মান বজায় রাখবার জন্য আত্মাহুতি দিয়েছেন। ...একজন বলেছিলেন, 'সতী হও' আর একজন বলেছিলেন, 'ধূপঘরে প্রতীক্ষা করো'।...দুজনের কথার সামঞ্জস্যের যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছি ;...এই ধূপঘরেই থাকবে আথাউল্লার সতী।...

জ্বলন্ত গন্ধকের ধারা প্রবল বেগে উপরের নালী দিয়ে ধূপঘরে পড়িতে থাকে ; ইংকাসতীর ব্যথাকাতর মুখ হইতে একটিও কাতরোক্তি বাহির হয় না।

...কেবল খেদ থেকে গেলো লোকে পূজো করবে ইংকারাজের সতী ব'লে। এই সুনামের বোঝা, এই সতীত্বের কলঙ্ক নিয়ে আমায় চলে যেতে হ'লো—আথাউল্লা।...

ভূত

ঝাড়ফুঁক অনেক হ'ল।

ওঝার সর্দার কানোয়া মুসহরকে আনানো হ'ল রহুয়া থেকে। সে এসে ছদিন অনবরত ছিলিমের পর ছিলিম গাঁজা টানে আর বাড়ির লোককে ফরমাশের পর ফরমাশে অতিষ্ঠ করে তোলে। সুরজকুঁয়রীর উপর যতক্ষণ না ভূতে আবার ভর করছে, ততক্ষণ তার মন্ত্র-তন্ত্র আরম্ভ হবে না। ছদিন থেকে সে ভাল আছে।

মার মন খুশী হয়ে ওঠে; কানোয়া ওঝার নামে ভূত পালায়— কথাটা তাহ'লে সত্যি।

সুরজকুঁয়রীর বাবা লালা ইন্দর পরসাদ্ মনে মনে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। তিনি নামে উকিলের মুহুরী, আসলে করেন মোকদ্দমার দালালি। মেয়ের অসুখের দৌলতে ফৌজদারী চারশ-ছত্রিশ ধারার শাঁসালো দায়রা কেসটা বেহাত হয়ে গেল। ধরহরা থানার সব মোকদ্দমা তাঁর একচেটে। একবার একখানা গাঁয়ের পাঁচটি মক্কেল হাতছাড়া হওয়ার মানে, চিরকালের জন্য গোটা গাঁখানা হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা; কেন না কোন হাকিমের

সাধ্যি নেই এ মোকদ্দমার আসামীদের বাঁধে। মাঝে থেকে জমিয়ে নেবে রামনেওয়াজ মুন্সী। দিন পনেরো থেকে চলছিল মেয়ের ফিট্। আজ দুদিন থেকে আছে বন্ধ। সারেনি ঠিকই। আবার হবে জানি। এখনই হয়ে গেলেই হয়; কানোয়া ওঝাটা বসে বসে গাঁজা আর টাকার শ্রাদ্ধ করছে কেবল।

যাক, আর বেশী দিন অপেক্ষা করতে হয় না।

সেই রকমই গোঙানি; সেই রকমই হাত-পায়ের খিঁচুনি। চোখ কপালে উঠেছে; সারা শরীর শক্ত পাথর, বেঁকে ধনুকের মত হয়ে যাচ্ছে; মট্ করে ভেঙ্গে যাবে বুঝি এখনই। চার জনে মিলে ধরে রাখা যায় না; ঠোঁট নীল হয়ে গিয়েছে, সোনার মত রঙ ফ্যাকাশে হয়ে আসছে। ইন্দর পরসাদ আর মেয়ের দিকে তাকাতে পারেন না; এ কি সাজা দিচ্ছ ভগবান!

ঐ একরত্তি মেয়ে এত কষ্ট কি সহ্য করতে পারে? মেয়ের মার চোখের জলে বুক ভাসছে। বিধবা পিসিমা চেঁচিয়েমেচিয়ে আরও অনর্থ বাধিয়ে তুলেছেন। পাড়ার মেয়েরাও একটি আধটি করে' গুটি গুটি এসে দাঁড়িয়েছেন উঠোনে।

দশরথার মা সাত তাড়াতাড়ি কলসী থেকে জল আনতে যায়, সুরজকুঁয়রীর মাথায় দেওয়ার জন্য। এর মধ্যেও পিসিমার শ্যেনদৃষ্টি সেদিকে পড়ে—জাতধর্ম আর কিছু রাখবে না এরা। ভরা কলসীটি উঠোতে গিয়ে তলাটা খসে' পড়ে। যা ভেবেছি তাই; কাজের চেয়ে অকাজ বেশী! তবু ভদ্রতার খাতিরে পিসিমাকে বলতে হয়, "ঐ ঘরে গিয়ে ভিজে কাপড়খান বদলে এস, দশরথার মা। আলনার উপর সুরিয়ার মার কাপড় আছে।"

দশরথার মা মরমে মরে যায়। ইন্দর পরসাদ অন্যদিকে তাকিয়ে থাকেন।

কানোয়া ওঝার ঝাড়ফুঁকের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানের আর শেষ নেই। শেষপর্যন্ত এক টুকরো জ্বলন্ত হলুদ সুরজকুঁয়রীর কানের ছিদ্রের মুখে লাগিয়ে ধরা হয়। কানের মধ্যেই নাকি সেই ভূতটা ঢুকেছে। হলুদের ধোঁয়া চামড়াপোড়া ধোঁয়া মিলে একটা অদ্ভুত গন্ধ বার হয়। মা ভয়ে চোখ বোজেন। ইন্দর পরসাদ শিউরে ওঠেন। সুরজকুঁয়রীর চোখের পাতা একটু যেন নড়ে; এই বুঝি সে যন্ত্রণায় চিৎকার করে' ওঠে! এখনই বোধহয় সে হাত দিতে কানের দরকচা-পড়া চামড়াটার উপর থেকে হলুদের ছাই ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করবে! "চেপে ধরে' থাকো হাত দুখান; ছেড়োনা যেন।" মা রামনাম জপ করেন।

ওঝা বলে, "কালকে ভূত পালাবে, আর সব ঠিক হয়ে যাবে। চামেলীর তেলের গন্ধ পাচ্ছি; সৌখীন মুসলমান ভূত। কালকে অমাবস্যার পূজো; আমাকে যেতে হবে মধৈলী। এখান থেকে এগারো কোশ। এখনি দিয়ে দাও আমার পাওনা দু' কাঠা ধান, পাঁচসিকে পয়সা, এক কুড়ি পান সুপুরি আর এক থান মেটে সিঁদুর।"

কাছারির ঝানু দালাল ইন্দর পরসাদ লোক চরিয়েই খান।

"সারবার আগেই পয়সা নিয়ে যাবে নাকি?"

"না দিতে ইচ্ছে হয় দিওনা। মধৈলী আজকে আমার যেতেই হবে।"

পিসিমা বলেন, "ব্রাহ্মণের আর ওঝার দক্ষিণে না দিলে কি কখনও কার্যসিদ্ধি হয়?"

দশরথার মা ফিসফিস করে বলে "এদের চটানো ভালো নয় বাপু।" কানোয়া ওঝা তার পাওনা নিয়ে চলে যাবার সময়, মা তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেন, আর বলে' দেন মধৈলীর

পুজো শেষ হ'লে আবার আসতে। একগাল হেসে ওঝা বলে' যায়—"নিশ্চয়ই আসব মা।"

"যতসব ঠগ জোচ্চোরের পাল্লায় পড়া গিয়েছে"—মুখে বলেন বটে ইন্দর পরসাদ, কিন্তু মনে মনে ভাবেন, লোকটা সত্যিই গুণী, না হ'লে ভূতটা যে মুসলমান সে কথা জানলো কি করে?

ভূতটা সত্যিই মুসলমান।

বেশ ছিল সুরজকুঁয়রী। দিব্যি হেসে খেলে বেড়াচ্ছিল। সুন্দর স্বাস্থ্য। এই এতখানি চেহারা দেখে কে বলবে তার মাত্র ষোল বছর বয়স। আদুরে মেয়ে, মা বাপের এক মাত্তর মেয়ে; মা বাবা তাই যত পারেন বিয়ের দিন পিছোচ্ছিলেন।—যে ক'টা দিন কাছে রাখা যায়। বিয়ে হলেই তো চলে, যাবে শ্বশুরঘর করতে।

"আর ঐ মেয়ে আবার এমনই!"—পিসিমা সকাল সন্ধ্যা টিকটিক করেন। আইবুড়ো ধিঙ্গি মেয়ে; দিনরাত এ বাড়ী ও বাড়ী পাড়া বেড়ানো; একবার বাড়ীর বার হ'লে আহার নিদ্রার খেয়াল থাকে না তার। সোমত্ত মেয়ে। তোদের বয়সে আমরা তিন ছেলের মা। যাকগে মরুকগে—যাদের মেয়ে তারা যা ভাল বোঝে করুকগে যাক। তবে এতটা নাই দেওয়া ভাল নয়। আজকালকার যুগই আলাদা। কে কার কথায় কান দেয়! আর মেয়ের মা বাবাই যদি না শুনলো তবে আর মেয়েকে ব'কেই বা কি, ঝ'কেই-বা কি।"

গুরুজনের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগে—এখন হাড়ে হাড়ে বুঝছেন ইন্দর পরসাদ আর তাঁর স্ত্রী।

"দোয়াত পুজো"র (চিত্রগুপ্তের পুজো) দিনের কথা। বচ্ছরকার দিনে নিজের বাড়ীর পুজো, খাওয়া দাওয়া মাথায় থাকলো, মেয়ে গেলেন তাঁর বন্ধু সম্পতিয়াদের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে। রামনেওয়াজ মুন্সীর মেয়ে সম্পতিয়া। খেয়ে দেয়ে তো মেয়ে রাত নটার সময় বাড়ী ফিরলেন।

সেই রাতেই আরম্ভ।

অর্ধেক রাত্তিরে চিৎকার করে ওঠে সুরজকুঁয়রী। আতঙ্কভরা আর্তনাদের সঙ্গে প্রাণটাও বেরিয়ে গেল বুঝি তার। কি হ'ল! কি হ'ল! মা ধড়মড়িয়ে ওঠেন। বাবা বারান্দার খাটিয়া থেকে নেমে, তাড়াতাড়িতে খড়ম খুঁজে পান না। সাপ না চোর? ভয়ে ঠক-ঠকিয়ে কেঁপে মরেন পিসিমা। ওঘর থেকে এ ঘরে আসবার সময় হাতের পিদিপ পড়লো বুঝি!

বাড়ীতে শোরগোল পড়ে' যায়।

"কি হয়েছে ইন্দর? ব্যাপার কি সুরিয়ার মা? ও সুরজ? অমন করে' কাতরাচ্ছিস কেন মা? কি হয়েছে বলবি তো! পেট কামড়াচ্ছে? মাজার কাপড় কি আঁট করে বেঁধেছে?"

সুরজকুঁয়রী তখন ঠেলা দিলেও সাড়া দেয়না। সে অজ্ঞান, অচৈতন্য হয়ে তখন পড়ে' রয়েছে। বিস্ফারিত চোখ; পলক পড়ছে না; আতঙ্কের ছায়া পড়েছে তাতে। কাকে দেখে যেন সে ভয় পেয়েছে। দাঁত লেগে গিয়েছে তার।

মাথায় একটু জল দাও। জাঁতিটা আনো তো, দেখি দাঁত খোলা যায় কিনা। জোর পাখা কর; আরে গায়ে না মাথার কাছে।—ইন্দর পরসাদের বিরামহীন ফরমাশে তাঁর চোখে ছানি-পড়া বোন দিশেহারা হয়ে পড়েন।

সেই থেকেই চলছে।

পরদিন সকালে জ্ঞান হ'লে সুরজকুঁয়রী বলে যে, সে ছাইভস্ম মাথামুণ্ড স্বপ্ন দেখছিল,—ভারি খারাপ। প্রথমে তো বলবেই না। পরে অনেক সাধ্যসাধনার পর মাকে স্বপ্নের সব কথা বলে।

...সে ফিরছিল সম্পত্তিয়াদের বাড়ী থেকে। তখন সন্ধ্যা হব-হব। কেষ্টচুড়ো গাছটার নীচে একজন মুসলমান। ঐ যে জৌনপুরী আতর-

ওয়ালাটা আসে না, তারই মত পোষাক। কাঁচা পাকা মেলানো লম্বা দাড়ি, ফর্সা রঙ; গালে একটি প্রকাণ্ড আঁচিল; মাথার সম্মুখে টাক, অথচ পিছনের চুল বড়বড় বাবরির মত করে' রাখা। লোকটা ইসারা করে' ডাকে আমাকে। ভয়ে প্রাণ উড়ে গিয়েছে আমার। প্রাণপণে দৌড়ুচ্ছি, আর সেই লোকটা তাড়া করেছে আমাকে ধরবার জন্যে। এই ধরলো বুঝি! আমাদের বাড়ীর খিড়কির দুয়োর সম্মুখে;—এই পৌঁছে গেলাম বলে; দুয়োরের চৌকাঠের বাইরে থেকেই হাত বাড়িয়েছে সে...

বলে আর সুরজকুঁয়রী হাউ হাউ করে কাঁদে। তার চোখ মুখের আতঙ্কের ভাব যায় না।

মা চোখের জল আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেন। "ভয় কি মা, আমিতো কাছে আছি।"

সুরজকুঁয়রী মার হাতখানা চেপে ধরে।

কিন্তু ভয় তার আর ভাঙ্গলো না। দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে। খুট করে শব্দ হলেও চমকে ওঠে। গাছের পাতাটি পড়লেও ভয় পায়। চব্বিশ ঘন্টা চোখমুখে ত্রস্তভাব। বাড়ীর লোকজনের মধ্যে থেকেও তার জগৎ আলাদা। সেখানে তাকে অনবরত ছুটতে হবে ঐ মুসলমানটার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে। এই আতঙ্কময় পরিবেশ কি তাকে পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত অনুসরণ করবে? এক মিনিটও কি সে শান্তি পাবে না, স্বস্তি পাবে না? ঐ বুঝি জানালা দিয়ে সেই দাড়িওয়ালা মুখটা উঁকিঝুঁকি মারছে! জানালার কপাটটা গিয়ে সে বন্ধ করে দেবে সে সাহসও নেই। পৃথিবীশুদ্ধ এত মেয়েরা যে হেসে খেলে বেড়াচ্ছে তাদের এমন হয়না কেন? মা চব্বিশ ঘন্টা তাকে চোখে চোখে রাখেন; কুয়োর জল তুলতে গিয়েই, কিম্বা উনুনের পাশেই যদি অজ্ঞান হয়ে যায়। ভয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে মার গায়ে।

রামজী, আমার মেয়েকে ভাল করে দাও। কি পাপ করেছি আমি ঠাকুর তোমার কাছে ?

তিন মাথা এক হয়। ইন্দর পরসাদ, তাঁর স্ত্রী, আর তাঁর বোন ফিস্ ফিস্ করে সলা পরামর্শ করেন,—বিয়ের যুগ্যি মেয়ে। একথা নিয়ে সাতমুখ করা উচিত নয়। কাছে-পিটের লোককে খবর দেবার দরকার নেই। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেই কথাটা রাখা ভাল। এমনিই এতদিনে হয়ত ঢিঢিক্কার পড়ে গিয়েছে পাড়ায় আর সমাজে। কি ভুলই হয়েছিল এত বড় মেয়ের বিয়ে না দেওয়া।

পিসিমা এই দুর্দিনেও শুনিয়ে দিতে ছাড়েন না;—পই পই করে বলে এসেছি নিত্যি তিরিশ দিন; মেয়ের বিয়ে দাও; বিয়ে দাও। তখন সে কথা কানে উঠবে কেন ? যা হবার হয়েছে ; এখন কেবল দেখো যে, ওঝা যেন কাছে-পিঠের না হয়। তাই আনা হয়েছিল রুপোলী থানার নামী ওঝা কানোয়া মুসহরকে।

সেদিন সেই যে পান সুপুরি নিয়ে গিয়েছে আর সে এ মুখো হয়নি।

"যত সব জোচ্চোর"—দুশ্চিন্তায় ইন্দর পরসাদের মেজাজের ঠিক নেই।

"মেয়ে যে এদিকে গেল। দিন দিন শুকিয়ে কাঠি হয়ে যাচ্ছে !"

"তার আমি কি করবো ?"

"তুমি করবে না তো কি ও পাড়ার রামনেওয়াজ মুন্সী করবে ?"

দিদির কথার ঝঙ্কারে ইন্দর পরসাদ বুদ্ধিমানের মত নরম হয়ে যান।

"তা এখন কি করা যায় ?"

ঠিক হয় রুস্তম রোজাকে ডাকার ; এ তল্লাটে অমন রোজা আর

নেই। ভগ্নির আপত্তি ছিল;—আইবুড়ো মেয়ে......মুসলমানে ছোঁবে...

ইন্দর পরসাদেরও মনের ভিতর খচ্ খচ্ করে।

সুরজকুঁয়রীর মা ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করে দেন; "মুসলমান ভূতের জন্য মুসলমান রোজারই দরকার।"

একটা অকাট্য যুক্তির আশ্রয় পেয়ে, ইন্দর পরসাদ এই বিপদের মধ্যেও একটু যেন উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।

রুস্তমকে খবর দিলে সে বলে, "ভূত যখন মেয়ের ঘাড়ের উপর সওয়ার হবে তখন মন্তরে কোন ফল হবে না। এখন মেয়ে অজ্ঞান বলছেন। জ্ঞান হতে দেন; তার পর খবর দেবেন—এই কাছেই তো। ভূতটা যখন বাড়ী ছেড়ে বাইরে যাবে সেই সময় ছাড়বো মন্তর, আর যাতে সে বাড়ীর ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে না পারে। চেনা-চেনাই তো ঠেকছে জিনের চেহারাটা।"

পরের দিন এসে রুস্তম রোজা বাড়ীর সীমানার উপর একটা কালো মুরগী জবাই করে; তারপর মন্ত্রপূত সরষে পুড়িয়ে সীমানার চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। পাঁচ মিনিটও সময় লাগে না। যাবার সময় সেলাম করে' বলে' যায়, "এখন দেখুন আপনার কপাল, মন্তরের তাকৎ, আর আমার হাতযশ।" দুদিন সুরজকুঁয়রী ভাল থাকে। আবার যে কে সেই। ইন্দর পরসাদের মনে সন্দেহ জাগে—যা দিনকাল পড়েছে। হয়ত রুস্তম ইচ্ছে করেই ভূতটাকে তাড়ায় নি।। হিঁদুর মেয়েকে পেয়েছে মুসলমান ভূতে; হয়তো রোজা মনে মনে খুশীই হয়েছে—যা দায়-সারা ভাবে নমো-নমো করে' কাজ শেষ করলো। তখনই সন্দেহ করা উচিত ছিল।...

পাতা, শিকড়, টোটকা-টাটকি অনেক কিছুই হ'ল। আর ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় চলে না! বাড়ীর লোকের রায় হয় ডাক্তার

ডাকায়। ডাকতে হ'লে বাঙ্গালী ডাক্তার, ডাক্তারীতে অত মাথা আর কারোর নয়। তা ছাড়া, হরিশ ডাক্তার একরকম বাড়ীর লোক। তার কাছে খুলে সব কথা বলা যায়। আরও এক কথা—নিজের জাত-বেরাদার ডাক্তার আনলে, কথাটা সমাজে প্রচার হবে বেশী;—বাঙ্গালী ডাক্তারই ভাল।

হরিশবাবু নিবারণ বাবুর ডিস্পেন্সারীর কম্পাউণ্ডার। ষ্টেথিস্কোপ গলায় ঝুলিয়ে তিনি সাইকেল থেকে নামেন। দরজার আড়াল থেকে সুরজকুঁয়রীর মা বিনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে তাঁকে মেয়ের ভূতে পাওয়ার সারা বৃত্তান্ত শোনান।

—তোমার ছেলে রাজা হবে ডাক্তারবাবু। আমার মেয়েকে সারিয়ে দাও। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।

"ভগবানই মালিক"—বলে হরিশ কম্পাউণ্ডার খস্‌খস্ করে প্রেসক্রপশন লিখে নিজের পকেটে রাখে।

"ছুটোর সময় ওষুধটা দিয়ে যাবো।"

হরিশ কম্পাউণ্ডারের ওষুধ বহুদিন চলে, শিশির পর শিশি। শেষকালে নিজেই কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে সে। ইন্দর পরসাদকে বলে ডাক্তারকে ডাকতে। এর উপর আর কথা নেই।

মা পিসিমা কেঁদে আকুল হন,—শেষকালে হরিশ ডাক্তারও জবাব দিলো!

নিবারণবাবু গম্ভীর প্রকৃতির লোক। ইন্দর পরসাদের কাছ থেকে সব শোনেন—আজ পর্য্যন্ত যা যা চিকিৎসা হয়েছে সব। দায়-সারা ভাবে নাড়ীটা দেখেন। চোখের পাতা; আঙুলের ডগা।

"জিভটা একটু দেখি, মা।"

তারপরই দেখেন—নিজের ঘড়িটি।

"বয়স কত হ'ল মেয়েটির?"

"এই ষোল বছর পূর্ণ হয়েছে।"

বাইরে এসে ফিয়ের টাকা পকেটে গুঁজতে গুঁজতে বলেন "কোন ওষুধের দরকার নেই। বিয়ে দিয়ে দেন তাড়াতাড়ি। ছেলেপিলে হলেই সেরে যাবে। দুধ খেতে দেবেন।"

ডিস্পেন্সারীতে ফিরে গিয়ে হরিশ কম্পাউণ্ডারকে বলেন "হিষ্টিরিয়ার কেস।"

ইন্দর পরসাদ রং ফলিয়ে বাড়ীতে সকলকে জানিয়ে দেন যে সোজা ব্যামো নয়; নিবারণ ডাক্তার বলেছে—হিষ্টিরির ভূত। স্ত্রীর কাছে একান্তে গলার স্বর নামিয়ে বলেন, আসল ভূত বাড়ীতে আনলে তবেই নকল পালাবে।

স্ত্রী চটে' যান—"এর মধ্যেও তোমার হাসি মস্করা আসে! এখন শীগগিরই এর একটা হেস্তনেস্ত করে' ফেলো।"

এর পর আরম্ভ হয় বর-খোঁজার পালা।

টুপি পরে', তিলক কেটে, লম্বা কোটের উপর পাট-করা চাদর ফেলে' চলে ছেলে-খোঁজার সফর। তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে হবে।

বিহারী কায়স্থরা সহরেই থাকে বেশী। তাদের পেশা কাছারিতে কলমনবিসী। জেলার কায়স্থদের মধ্যে চাষবাস করে' খায়, গাঁয়ে থাকে, এমন লোক হাতে গোনা যায়। কথায় বলে, কলমের জোর থাকলে কি হয়, একটা মুলো উপড়োতে তিনজন কায়েতের দরকার হয়। কিন্তু সহরের ছেলে পাওয়া শক্ত। খাঁই তাদের বাপদের বেশী। তারা চার হাজারের কম তিলকের (বরপণ) কথা বলে না।' তা ছাড়া, ছেলের নিজের ফরমাস আলাদা আছে। দ্বিরাগমনের সময় আবার আর একদফা লম্বা খরচের ফর্দ।

সোজা কথা কেউ বলবে না; ভাবে এক, আর বলে আর; কাছারিতে

কাজ-করা লোক কিনা;—নিজেকে দিয়েই তা বুঝতে পারেন ইন্দর পরসাদ।...সব কটাকে চিনেছি। মেয়ের বিয়েটা হয়ে যেতে দাও না একবার, তারপর টের পাওয়াবো।

এখন কিন্তু চোরের মত থাকতে হয় ইন্দর পরসাদকে। কি জানি ভাল না করতে পারুক, মন্দও তো করতে পারে লোকে। হয়ত অসুখের কথাটা ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে প্রচার করে' দেবে। এখনই, যে করছে না তা কে জানে? ছেলের বাপরা যে ধরা-ছোঁয়া দিচ্ছে না, তা হয়ত বা সুরজকুঁয়রীর ভূতে পাওয়ার খবরটা পেয়েই। কথা হাওয়ায় ওড়ে। কে জানে?

সহর ছেড়ে ছুটতে হয় গাঁয়ের পথে—টিকিয়ে টিকিয়ে গরুর গাড়ীর সফরে। সঙ্গে রামবিরিচ চাকর—তামাক সাজা, তেল মাখানো, আর রাতে শোবার সময় গা হাত-পা টিপে দেবার জন্য। এ না করলে কায়স্থ পরিবারের লোকেরা মেয়ের বাড়ীর আভিজাত্যে সন্দেহ করবে। কাজকর্ম মাথায় উঠেছে। রোজগারের নামে খোঁজ নেই, কেবল ঘোরো নিত্যি, তিরিশ দিন। এর থেকে নিস্তার নেই, যতদিন মেয়ের একটা হিল্লে না হয়। তারপর সফর থেকে ফিরে বাড়ীতে ঢোকো। চৌকাঠ মাড়িয়েছো কি দিদি বলবেন—"কি, কিছু হ'লো? সে আমি আগেই জানি। মেয়েটাকে মেরে ফেলবে এই করে'। পনের দিনে রামায়ণ শেষ করা যায়, আর তুমি একটা মেয়ের বিয়ের ঠিক করতে পারলে না!"

সুরজকুঁয়রীর মা কিছু বলেন না, কেবল কাঁদেন।

"তা হ'লে আজোকোপ্পার ছেলেটিকেই ঠিক করি, কি বলো?"

কোন উত্তর পান না। তবে তার বিরুদ্ধে আজ আর আপত্তির সাড়াও আসে না।

আজোকোপ্পা গ্রামের গজাধর পরসাদ, ছেলেটি মন্দ নয়। বেশ

জমিজমা আছে; বড় গেরস্ত। তবে তাদের বংশের দোষ আছে। তারা "কিষণপচ্ছী" কায়স্থ, অন্য জাতের রক্ত আছে তাদের দেহে। ছেলেটিও একটু যেন রোগা-রোগা গোছের। আগে একটা "নৌটাঙ্কির" (একরকম গ্রাম্য অভিনয়) দল ছিল তার। তাই নিয়ে জেলার সব মেলাগুলিতে ঘুরতো। ঘর থেকে কিছু লোকসান দিয়ে, বাপ মারা যাওয়ার পর ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছেন। এখন ছেলেটি নিজের খেত-খামার দেখে।

এর আগে যখনই এই ছেলেটির কথা উঠেছে তখনই, মেয়ে ছেলেদের কথা ছেড়েই দাও, ইন্দর পরসাদও মনের ভিতর থেকে এর প্রতিবাদ করে এসেছেন। "অম্বষ্ঠ" কায়স্থ তিনি। কত উঁচু তাঁর জাতের খ্যাতি; ওখানে মেয়ের বিয়ে দিতে যাবেন জাত খোয়াতে! তার ওপর পাড়াগাঁয়ে বিয়ে দিয়ে! সে বাড়ীর মেয়েরা হয়ত তামাক খায়, রাত তিনটেয় উঠে ধান ভানে। তাদের ঘরে দিতে যাবো সুরজকুয়রীর মত মেয়ে!—যে চিঠি লিখতে জানে, রামায়ণ পড়তে জানে, লোয়ার প্রাইমারী পাশ। মরে' গেলেও নয়।...

ঘটনার তাগিদে পিসিমার প্রতিবাদ পর্য্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এসেছে— "কিষণপচ্ছী ছেলে আবার টাকা নেবে কি?" টাকার প্রশ্নটাই যেন বড়। কিষনপচ্ছীতে আর আপত্তি নেই।

এখন এ বিয়ের পক্ষে অজস্র যুক্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে,—একটা পয়সা খরচা নেই, অবস্থা ভাল, যে দিন বলো সেদিনই বিয়ের দিন ঠিক হয়ে যেতে পারে; সুরজকুঁয়রী সেরে উঠবে, মেয়েটা শান্তিতে থাকতে পারবে।

এইখানেই শেষ পর্যন্ত বিয়ের ঠিক হয়ে যায়। অম্বষ্ঠ কায়স্থের মেয়ে পাবার উল্লাসে, বরপক্ষ—মেয়ে দেখতে কেমন—এ খবর পর্যন্ত পাড়ার লোকের কাছ থেকে নেবার চেষ্টা করে না।

দুপক্ষই লাভে আছে—দোকানদার চালাচ্ছে বস্তাপচা মাল, আর খদ্দের দিচ্ছে অচল টাকা।

মেয়ের পক্ষই হুকুম দেয়।—তড়িঘড়ি সব করতে হবে। এই মাসেই হাওয়া চাই। মেয়ে আমার বড়, দ্বিরাগমন বিয়ের সঙ্গেই করতে হবে।

ও পক্ষ সব সর্তেই রাজী।

ইন্দর পরসাদ আবার বেশী সাবধানী লোক। বিয়ের দিন পাড়ার ছেলেদের তৈরী করে রাখেন লাঠি নিয়ে; কি জানি বিয়ের দিন আবার যদি সুরজকুঁয়রী অজ্ঞান হয়ে যায়, আর তাই নিয়ে বরপক্ষ যদি গোলমাল করে।

বিয়ের দিন পাড়ার মেয়েরা প্রাণ ভরে' গানের সুরে বরযাত্রীদের অকথ্য গালাগালি দেয়। বেয়ানের উদ্দেশে গালি দেবার সময় পিসিমার কণ্ঠস্বর আর সকলের গলা ছাপিয়ে ওঠে—

"বেয়ানের ছেঁদো পীরিতে আজোকোপ্পা ডুবেছে,

কত রসিক নাগর মজেছে,

বেয়ানের মিঠে গলার স্বরে পাড়ার ভূত পালায়,

বেয়ানের..."

পিসিমার গলার স্বরে কিনা জানি না—ভূত সেদিন সুরজকুঁয়রীর উপর ভর করেনি। কোন রকমে দুর্গা দুর্গা করে' বিয়ে হয়ে যায়।

কাঁদতে কাঁদতে পাড়া মাথায় করে' সুরজকুঁয়রী বরের সঙ্গে গরুর গাড়ীতে গিয়ে ওঠে।

আরম্ভ হয়ে যায় তার নতুন জীবন সেই মাস থেকে। মধুর আলোয় রঙীন হয়ে ওঠে তার জগৎ। কোন বিভীষিকার ছায়া নেই তাতে।

নতুন নেশার মিঠে মাদকতায় ভরা একটা বছর প্রায় ঘুরে আসে। স্বপ্নের মত মধুর মাস কয়টি কোথা দিয়ে কেটে যায় সুরজকুঁয়রী তা বুঝতেও পারেনা।······তা বলে সেই মুসলমানের স্বপ্নের মত নয়। মা গো মা, এখনও সে কথা মনে করলে বুক ঢিপ ঢিপ করে। যেতে চায় না সে আর বাপের বাড়ী এ জীবনে। অশেষ করুণা তোমার, রামজী! সে ভূত জীবনে আমাকে ছাড়বে তা ভাবিনি। ভেবে-ছিলাম তার হাত থেকে পালাতে পালাতেই প্রাণটা বেরিয়ে যাবে।

এখানে এসে কেবল একদিন সেই মুসলমানটা এসেছিল রাতের অন্ধকারে। ভাদ্দর মাস; টিপ-টিপুনি বৃষ্টি হচ্ছে। গঙ্গাধর গিয়েছে ভিন গাঁয়ে, আধিয়ারের কাছ থেকে ভাদই ধানের ভাগ নিয়ে আসতে। সে রাত্তিরে সে শাশুড়ীর ঘরে শুয়েছিল। ঘুম আর আসে না। এপাশ ওপাশ করতে করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। ভোর রাত্রে শাশুড়ী এক ঘুম সেরে উঠলেন;······পাশের খাটিয়া থেকে সুরজকুঁয়রী তাঁর তামাক খাওয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছে;······একটু যেন তন্দ্রার ঘোর এসেছে এসেছে······এখন সময় সেই—সেই লোকটা!······

"কাতরাচ্ছ কেন বৌমা? বুকে হাত দিয়ে শুয়েছো নাকি?" যাক সেদিন ব্যাপার খুব বেশী দূর পর্যন্ত গড়ায়নি। শাশুড়ী বুঝতে পারেন নি।

কেবল সেই একদিন।

তা না হলে শ্বশুরবাড়ী সত্যিই তার স্বর্গ। তবে চব্বিশ ঘণ্টা ইচ্ছে করে যে গঙ্গাধর তার কাছে কাছে থাকুক। অকূল সমুদ্রের একমাত্র আশ্রয়কে সে মুহূর্তের জন্যও ছাড়তে রাজী নয়।

গঙ্গাধর বলে, দিনের বেলায় তোমার সঙ্গে গল্প করলে মা কি বলবেন, পাড়ার লোকে কি বলবে?

সুরজকুঁয়রীর এ কথা মনে ধরে না।

রোজই গঙ্গাধর বিকেলে আড্ডা দিতে যায়, দু মাইল দূরে বিরৌলী বাজারে, আর রাত নটা দশটায় ফেরে। এই সময়টুকুর তর সয় না সুরজকুঁয়রীর। আর এই সঙ্গলিপ্সার পিছনে আছে এক আতঙ্ক, গঙ্গাধর চলে' গেলেই আবার বুঝি সেই মুসলমানটা আসবে। মনে করার সঙ্গে সঙ্গেই ঝনাৎ করে' মাথার মধ্যে, কানের মধ্যে যেন একটা শব্দ হয়;—একটা কপাট খুলে মাথার মধ্যের সব জিনিস যেন বেরিয়ে গেল মাথা খালি করে'। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে।' সে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে নিজেকে সামলে নেয়। এসব লক্ষণের ক্রম আর মাত্রা এখন তার নখদর্পণে। সে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে গঙ্গাধর কাছে থাকলে ভূতটা পালাবে, আলো সম্মুখে রাখলে ছায়া যেমন পিছনে পালায়। তাই সে গঙ্গাধরকে আঁকড়ে ধরে' রাখতে চায়, নিজের মনের মধ্যে পুরে রাখতে চায়। কেবল ভাল লাগে বলে' নয়, নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যও গঙ্গাধরকে তার দরকার। অথচ তার মনের এই গোপন কোণটির খবর তার স্বামী রাখে না। প্রত্যহ সন্ধ্যায় বিরৌলী বাজারের নারাঙ্গীলালের গোলায় গঙ্গাধর তার স্ত্রীর প্রেমের শতমুখে প্রশংসা করে।

বছর ঘুরে আবার চিত্রগুপ্তের পুজো এসেছে—লালা কায়েতদের সব চাইতে বড় পুজো; বিরৌলী বাজারে এই বারোয়ারীপুজোয় কত ধুমধাম।

সুরজকুঁয়রীর ছোট ননদ রেশমী এসেছে বাপের বাড়ী; দশহারার সময়,—ছটপরবের পর শ্বশুর বাড়ী যাবে। সুরজকুঁয়রীর শরীর খারাপ।

"এই অবস্থায় রাতের বেলায় গরুর গাড়ী করে' দু মাইল দূরে

বিরৌলী বাজারে যাবে মেলা দেখতে! না না, রেশমী তোদের গিয়ে কাজ নেই।"

পান জর্দা মুখে গুঁজে বিরৌলী যাবার জন্য তৈরী হয় গঙ্গাধর।

"পানের ডিবেটা ভরে' দিয়েছো তো? আর এ বছর চিত্রগুপ্তের মেলা নাই বা দেখলে। আর কটা মাস কেটে যাক ভালয় ভালয়; তারপর তোমাদের গঙ্গীঘাটের মেলায় নৌটাঙ্কি দেখিয়ে আনবো। এ দুমাস একটু সাবধানে থাকতে হয়।"

সুরজকুঁয়রীর চোখ ছলছল করে' আসে।

"আমার ফিরতে আজ রাত হবে";—বাড়ী থেকে বেরুনোর সময় গঙ্গাধরের মনটাও খারাপ হয়ে যায়।

সন্ধ্যায় খাওয়া দাওয়ার পর বাড়ীর দরজায় বসে' মেয়েরা গল্প-গুজব করছে।

"মেলার বাজনা মনে হচ্ছে যেন আমাদের দোরগোড়ায় বাজছে।"

"রাতের বেলা কিনা, তাই।"

গঙ্গাধরের মা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন "তোর খুব যেতে ইচ্ছে করছে বুঝি, রেশমী।"

"বৌদি যাবে না, আর আমি যাবো বুঝি? আর আমার শ্বশুর বাড়ীতে তো প্রত্যেক বছর দেখিই।"

"তোর বৌদির কি এই অবস্থায় রাত বিরেতে যাওয়া উচিত! তার উপর কার্তিকের হিম।"

"আমি কি বলছি, নাকি যেতে?"

"ছেলে আবার যদি রাগ করে, তাইতো ভয়। পানের থেকে চুনটি খসলে তো আর রক্ষে নেই। এতকাল পরে এলি, আর চিত্রগুপ্তের পূজোর মেলা দেখবি না। এ আমার ভাল লাগছে না।

দাঁড়া ডাকি গুল্টেনকে। ওরে ও গুল্টেন। গাড়ীতে পোয়াল বিছো, আর বিছানা দে। সাবধানে নিয়ে যাবি খানা ডোবা বাঁচিয়ে, আস্তে আস্তে।"

মেলার কাছাকাছি পৌঁছে সুরজকুঁয়রী আর রেশমী দুজনেরই ভয় করে,—গঙ্গাধর আবার তাদের দেখে না ফেলে। মেলা দেখে শীগগিরই তারা বাড়ী ফিরে যাবে। শাশুড়ী বলেছেন, জেগে বসে থাকবেন; গঙ্গাধর বাড়ী ফিরবার আগেই ফেরা চাই কিন্তু।

সারি সারি আলোর কাছে গিয়ে পড়েছে তারা।

"ওখানে কি হচ্ছে রে গুল্টেন?"

"থেটার"

"থিয়েটার তা আগে বলিসনি কেন গুল্টেন। চল চল ঐ খানেই। মেয়েদের জায়গার দিকে গাড়ী খুলিস।"

থিয়েটার তখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। পালার নাম "সমরু"। অজস্র দর্শকের কোলাহলের মধ্যে একবর্ণও শুনবার কি বুঝবার উপায় নেই। তবুও সুরজকুঁয়রী আর রেশমীর বেশ লাগে। কি সুন্দর রাজার পোষাক। কি রকম করে' তরোয়াল ঘুরোচ্ছে! ভয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করে। সত্যিকারের আগুন জ্বালিয়েছে ষ্টেজের উপর; এখনই আগুন টাগুন লেগে একটা অনর্থ হয় বুঝি। পাহাড়ে রাস্তায় হোঁচট খেতে খেতে আগুন লক্ষ্য করে' চলে' আসছে রাবেয়া। কি সুন্দর মুখখানি তার। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়েছে রফিক্‌। অজ্ঞাত কারণে একটু যেন শিউরে ওঠে সুরজকুঁয়রী।...... রফিকের পিঠের দিকটা কেবল দেখা যাচ্ছে; শিরোয়ানী আর চুস্ত পায়জামা পরণে।...

শিরদাঁড়ার মধ্যে দিয়ে একটা ঠাণ্ডা ঝিমঝিমুনী ধীরে ধীরে সুরজকুঁয়রীর সর্ব্বশরীরে ছড়িয়ে পড়ে।

......ঠিক জৌনপুরী গন্ধতেল-ওয়ালার মত দেখতে।

গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে তার। মুহূর্ত্তের জন্য নিজের মনকে ভুল বোঝবার চেষ্টা করে; কিন্তু নিজের কাছে নিজেকে কতক্ষণ ফাঁকি দেওয়া চলে?

...—ঐ তো সেইরকমই বাবরী চুল পিছনে। আর কোনো ভুল নেই——

ঝনাৎ করে' একটা শব্দ কানের পর্দায় আঘাত করে। মাথার মধ্যেটা খালি হয়ে যাচ্ছে। অজস্র রেলের এঞ্জিনের গর্জ্জন স্নায়ুমণ্ডলীকে একেবারে তছনছ করে দিচ্ছে।—ভগবান! এ কি করলে? এই জন্যই কি এখানে এসেছিলে আজ! দম বন্ধ হয়ে আসছে। চোখ বুঁজবার ক্ষমতাও নেই।

......জানি এ পর্ব একবার আরম্ভ হ'লে আর থামে না। এর শেষ পর্যন্ত আমাকে দেখতে হবে। তার আগে নিস্তার নেই। রফিক যদি সম্মুখে না ফেরে তাহ'লে হয়। হয়ত ওর মুখটা অন্যরকম; পিছনের দিক থেকে সেই মুসলমানটার মত দেখাচ্ছিল। রামজী বাঁচাও আমাকে, ওর মুখ যেন আমাকে দেখতে না হয়। তাও কি হয়! এ আমার ভবিতব্য। এই লোকটা চিরজীবন আমায় অনুসরণ করবে। আমার জীবন বিষ করে তুলবে।......এই বার,—এইবার সে এদিকে মুখ করে' দাঁড়াচ্ছে। সেই কাঁচাপাকা দাড়ি; সেই চোখ মুখ, গালের আঁচিল, মাথার সম্মুখের দিকের টাক, সেই শয়তানি হাসি; ভুল হওয়ার কি জো আছে!—ঐ—ঐ যে সে এগিয়ে আসছে আমার দিকে!

শরীরের সব স্নায়ু শিথিল হয়ে আসে। চিৎকার করে' ওঠে সুরজকুঁয়রী। সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে।

রেশমী আর কয়েকজন মহিলা মিলে তাকে অচৈতন্য অবস্থায় গরুর গাড়ীতে এনে শুইয়ে দেয়।

—ভিড়ে গরমে ভির্মি গিয়েছে।

—খানিকক্ষণ গাড়িতে ঠাণ্ডা হাওয়ায় শুয়ে থাকলেই সেরে যাবে।

—বাড়ীর লোকেরও বলিহারি। ভরা পোয়াতিকে এই ভিড়ের মধ্যে নিয়ে এসেছে!

—ওরে ছোঁড়া, তোরা এখানে ভিড় করছিস কেন?

এরপর মহিলারা আবার চিক্-ঘেরা জায়গাটাতে গিয়ে বসেন থিয়েটার দেখতে।

"শুণ্টেন খুব আস্তে আস্তে চালাস গাড়ি"—ভয়ে গলার স্বর বেরোয় না রেশমীর ভাল করে।"

—ভোর রাত্রে সুরজকুঁয়রীর জ্ঞান হয়।

শাশুড়ী দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছেন আর আপন মনে বকে চলেছেন,—কোথাকার জল এখন কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় বলা যায় না। কেন মরতে যেতে দিয়েছিলাম বৌকে মেলায়। এখন ছেলে জিজ্ঞাসা করলে কি জবাব দেবো? হাঁরে রেশমী, কোন হাড়টাড় কিছু মাড়ায়নি তো বৌমা? কোন চোট্‌টোট্ লাগেনিতো? ভালয় ভালয় এখন বিপদটা কাটলে বাঁচি।

রেশমী ঠায় বসে আছে সুরজকুঁয়রীর শিয়রে। জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গেই সুরজকুঁয়রী বলে, "এখুনি আবার ফিরে আসবে।"

রেশমী সায় দেয় "হাঁ, এই এসে পড়লো বলে।" সুরজকুঁয়রী শিউরে উঠে ননদের হাত চেপে ধরে; একেবারে পিষে ফেলবে বুঝি। কেন, তা রেশমী বুঝতে পারে না।

শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করেন, "কি বলছে কি বৌমা?" রেশমী জবাব দেয়না। বৌদি বলছে দাদার কথা;—এ কথা কি মার কাছে বলা যায়।

বাইরে দরজার কড়ায় শব্দ হয়। মার মাথায় আকাশ ভেঙে

পড়ে—এখন ছেলেকে কি বলবেন? সুরজকুঁয়রী এ শব্দে চমকে ওঠে। রেশমী ধরমড় করে তার মাথার কাছ থেকে উঠে দাঁড়ায়;—"ঐ এসে পড়েছে ভাইয়া। বল্লাম না?" সুরজকুঁয়রী মাথার কাপড় টেনে দেয়। শাশুড়ী আলো নিয়ে সদর দরজা খুলে দেন। চমকে যান ছেলের চেহারা দেখে।

"ওকি করেছিস একগাদা রং মেখে? গালের উপর ওটা কি আঁচিলের মত?"

গজাধর সেটাকে নখ দিয়ে খুঁটে ফেলে; আর হাসতে হাসতে বলে, "সকালে ধুয়ে ফেলা যাবে রং। থিয়েটার করেছিলাম আজ মেলায়। বললেই আবার সবাই মেলায় যাবার বায়না ধরবেনা। তাই বাড়িতে বলিনি।"

রেশমী এসে পড়ে সেখানে।

"নৌটাঙ্কির সখ তোমার এখনও মেটেনি দেখছি। কি থিয়েটার? কি সেজেছিলে?"

"রফিক বলে' একটা ছোট্টো পার্ট ছিল।"

"এদিকে আর একটি প্রাণী তো ঘরে হেদিয়ে ম'লো। এইবার একটু নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমুইগে যাই।" এসব কথা সুরজকুঁয়রীর ঘর পর্য্যন্ত পৌঁছোয় না।

"সুরিয়া! ও সুরিয়া! ঘুমিয়ে নাকি?"

সুরজকুঁয়রীর মনের আবিল্য কেটে আসে। আতঙ্কজনক জগতের রক্ষাকবচ এখন তার মুঠোর মধ্যে। আর তার কিসের ভয়? থিয়েটার দেখার কথা স্বামীকে বলা হবেনা; শাশুড়ী বলে দিয়েছেন কিনা, তাই বা কে জানে!

তার মধুময় জগতের পরিবেশে সে পৌঁছে গিয়েছে। মুসলমানের বিভীষিকার রাজ্য পিছনে ফেলে সে এসেছে। গজাধরের অপ্রশস্ত

বুকের সঙ্গে আরও ঘেঁষে শোয় সে। এই নির্বিঘ্ন আশ্রয়ে এসে পৌঁছে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। বুকের স্পন্দনের শব্দ শোনা যাচ্ছে, —নিজের না ওর, তা বুঝা যায় না। এই বুকের আড়ালে থাকলেই কেবল সে সেই সয়তানটার হাত থেকে বাঁচতে পারে। কফিল মিয়ার বাড়ি মুর্গী ডেকে ওঠে। এত তাড়াতাড়ি! সুরজকুঁয়রীর ভয়ের আঁধারতো আগেই কেটেছে, তবে রাতের আঁধার এত শীগগির কাটার কি দরকার ছিল! ঘুমন্ত গঙ্গাধরের আঙুল এসে পড়েছে সুরজকুঁয়রীর কানের সেই জামড়পড়া জায়গাটায়! আস্তে আস্তে আঙুল কটাকে সরিয়ে সুরজকুঁয়রী মাথার চুল দিয়ে সেই দরকচা-পড়া জায়গাটা ঢেকে দেয়।